

শারঈ মানদণ্ডে তাকলীদ

প্রশ্ন ও সংশয় নিরঞ্ন



লেখক

হাফেয জালালুদ্দীন কাসেমী

(ফাযেলে দারুল উলুম দেওবন্দ, ভারত)

تقلید کی شرعی حیثیت

اشکالات اور شبہات کا ازالہ

শারঈ মানদন্ডে তাক্বলীদ

প্রশ্ন ও সংশয় নিরসন

লেখক:

হাফেজ জালালুদ্দীন কাসেমী

ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ (ভারত), আলোচক: পিস টিভি উর্দু, (ভারত)

অনুবাদ:

শাইখ নুরুল আবসার

উপাধ্যক্ষ, মাদ্রাসা দারুল সুন্নাহ, মিরপুর, ঢাকা।



পরিবেশনায়

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

ঢাকা-বাংলাদেশ

শারঈ মানদণ্ডে তাকুলীদ: প্রশ্ন ও সংশয় নিরসন

লেখক: হাফেজ জালালুদ্দীন কাসেমী
ফায়েলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত।

গবেষণা ও পর্যালোচনা : মুহাম্মদ আরশাদ কামাল
হাদীস তথ্যানুসন্ধান: আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আখতার
সম্পাদনা ও পুনঃনিরীক্ষণ: ড. হাফেজ শাহবাজ হাসান

অনুবাদক: শাইখ নুরুল আবসার
উপাধ্যক্ষ, মাদ্রাসা দারুস সুন্নাহ, মিরপুর, ঢাকা।

প্রথম প্রকাশ: মে ২০১৫

পরিবেশনায়ঃ

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

[কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর গণ্ডিতে আবদ্ধ নির্ভরযোগ্য প্রকাশনায় সচেষ্ট]

৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০

ফোন: 7112762, 01190-368272, 01711-646396, 01919-646396

ওয়েব: www.tawheedpublications.com

ইমেল: tawheedpp@gmail.com

অক্ষর বিন্যাস: নুহা কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টিং

মোবাইল: 01738-419-619

ই-মেইল: nuhacomputer15@gmail.com

মূল্য: ৬০ (ষাট) টাকা মাত্র

মুদ্রণ: মায়ের দোয়া অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, বাদামতলী, ঢাকা-১১০০

www.shottanneshi.com

অনুবাদকের কথা

আলহামদু লিল্লাহ। সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর যিনি মানবজাতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে নির্বাচন করেছেন। শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম প্রধান কারণ হলো তার মেধা ও জ্ঞান। মানুষ তার মেধা দিয়ে পরখ করে বুঝতে পারে ভাল ও মন্দ। ভাল মন্দ পরখ করে বিবেক খাটিয়ে চলার জন্যই তার এই শ্রেষ্ঠত্ব। কিন্তু কিছু বিষয় এমন আছে যা তার মেধার আয়ত্বের বাইরে। আয়ত্বের বাইরের সেই বিষয়ে মেধাকে মানদণ্ড বানাতে তার বিপথগামী হওয়া অনিবার্য। শ্রেষ্ঠ মাখলুকগুলো যাতে বিপথগামী না হয় তাই যুগে যুগে আল্লাহ তা'আলা পাঠিয়েছেন অনেক নবী-রাসূল। যারা একটু বিবেক খাটিয়েছে এবং নবীর সংবাদকে নিরঙ্কুশভাবে মেনে নিয়েছে তারাই হেদায়াত প্রাপ্ত হয়েছে। আর যারা মেধাকে নবীর কথার উপর প্রাধান্য দিয়েছে এবং আল্লাহর দেয়া এই শ্রেষ্ঠ নেয়ামতকে একটুও না খাটিয়ে বাপ-দাদার রেখে যাওয়া রীতি-নীতির উপর অবিচল থেকেছে তারা গোমরাহ বা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

আল্লাহর সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)। কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী আসবেন না। তাই কিয়ামত পর্যন্ত সব মানুষকে তাঁর বিধানকেই নির্দিধায় মেনে নিতে হবে। তাঁর বিধানই মূলত আল্লাহর বিধান। কিন্তু তাঁর ওফাতের পরের মানুষগুলো তো তাকে পাবে না। সেই মানুষগুলো যেন বিপথগামী না হয় সে জন্য আল্লাহ তাঁর নিজের বাণীর মতই নবীর বাণীগুলো হেফাজতের ব্যবস্থা করেছেন। এখন মানুষের কাজ হলো তাঁর রেখে যাওয়া বাণী ও নির্দেশনাগুলোর অনুসন্ধান করা এবং এর উপর আমল করা। জ্ঞানের উর্দ্ধ বিষয়ে কোন সময়ই মাথা না ঘামানো। জ্ঞানায়ত্ব বিষয়ে নিজ মেধা থেকে গবেষণার মাধ্যমে কিছু বলে থাকলে এর বিপরীত যদি তাঁর কোন বাণী এসে যায় তবে সাথে সাথে তা প্রত্যাখ্যান করতঃ তাঁর বাণী ও আমলের দিকে ফিরে যাওয়া। এটাই ছিল খাইরুল্ল কুর্ব্বান তথা সোনালী তিন শতাব্দীর আলেমদের রীতি।

শ্রদ্ধেয় মহামান্য মুজতাহিদ ইমামরা বিশেষ করে আজ পৃথিবীর আনাচে কানাচে যাদের সুনাম, সুখ্যাতি, পাণ্ডিত্য সার্বজনীন তাদের সবাই এই রীতির উপর চলেছেন। তারা এই রীতির উপর না থাকলে- না ইমাম

আবু হানিফা মুজতাহিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতেন, না ইমাম মালেক, না ইমাম শাফেঈ, না ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল। ইমাম আবু হানিফা (রহমতুল্লাহি আলাইহ) এর ছাত্র হয়ে আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ ও যুফারের নাম ইমাম ও মুজতাহিদের তালিকায় থাকত না। আবু হানিফা (রহমতুল্লাহি আলাইহ) এর ছাত্রের ছাত্র শাফিঈর নাম মুজতাহিদের তালিকাভুক্ত হওয়া থেকে শত মাইল দূরে থাকত। ইমাম আহমাদ (রহমতুল্লাহি আলাইহ) তাঁর পূর্বের তিন জনের যে কোন একজনের কথা নির্দিধায় মেনে নিয়ে চলতে পারতেন, তিনিও মুজতাহিদের তালিকায় আসতেন না। মোটকথা, চার জনের কারো নামই মুজতাহিদের তালিকায় থাকত না। আবু হানিফা (রহমতুল্লাহি আলাইহ) যদি তাঁর কোন একজন উস্তায়ের নিরঙ্কুশ অনুসরণ করে যেতেন তবে তার নাম ইমাম আ'যম দূরের কথা ইমামের তালিকায়ও আসার কথা নয়।

কিন্তু না। কেননা তারা দ্বীনকে আমাদের তুলনায় অনেক বেশি বুঝেছিলেন। বুঝেছিলেন কার কথা দ্বিধাহীনভাবে মেনে নিতে হবে আর কার কথা যাচাই করে মানতে হবে। কোন কথা বললে আর কোন গবেষণার সুযোগ নেই, কোন কথা বললে আরো গবেষণার সুযোগ রয়েছে। কোন কথায় দ্বীমত পোষণের সুযোগ নেই, কোন কথায় দ্বীমত পোষণ করা যেতে পারে। সবাই তাদের অনুসারীদের কঠোর ভাষায় সতর্ক করে গেছেন এই বলে, কেউ যেন তাদের কথাকে নবীর কথার স্থান না দেয়, তাদের আমলকে নবীর আমলের মর্যাদা না দেয়। একমাত্র যে কথা ও আমলটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কথা ও আমলের সাথে মিলবে কেবল সেই কথা এবং মতামতটিকেই নিজের জীবনের অনুসরণীয় বলে জানবে। তাই তাদের কেহই একক আবু বাকর (রাঃ) এর অনুসরণ করে বাকারী হননি, এককভাবে উমার (রাঃ) অনুসরণ করে উমারী হননি। একমাত্র আলী (রাঃ) এর অনুসরণ করে আলাবী হননি। শুধুমাত্র আয়েশা (রাঃ) এর মতামতকে মেনে আয়েশী হননি। ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর একক অনুসরণ করে মাসউদী হননি। হাদীসের বিশাল ভান্ডারের বর্ণনাকারী আবু হুরাইরা (রাঃ) এর একক অনুসরণ করে হুরাইরী হননি। মু'আয (রাঃ) এর একক অনুসরণ করে মু'আযী হননি। এভাবে ইমাম আবু হানিফা (রহমতুল্লাহি আলাইহ) এবং ইমাম মালেক (রহমতুল্লাহি আলাইহ) এর এমন অনেক উস্তায় ছিলেন যারা মুজতাহিদ হওয়ার

সাথে সাথে দীর্ঘ দিন সাহাবাদের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছেন। সাহাবাদের সহচর্যপ্রাপ্ত প্রখ্যাত কোন ফক্বীহও একক কোন সাহাবীর অনুসরণ করে তারা সেদিকে সম্পৃক্ত হননি।

কিন্তু অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় হলেও সত্য যে, অতিভক্তি মানুষের গোমরাহীর অন্যতম কারণ। যে যাকেই মুশরিক বা বিদ'আতী বলে আখ্যা দেন না কেন সবকিছুর পিছনের মূলহোতা এই অতিভক্তি যা শয়তানের অন্যতম অস্ত্র। যেই অতিভক্তির কারণে যে ব্যক্তিকে আপনি বিদ'আতী বা মুশরিক বলছেন সে উল্টো আপনাকে কাফের, বে'আদব, অকৃতজ্ঞ ইত্যাদিতে ভূষিত করছে। খাইরুন কুর'ানের পর প্রসিদ্ধ চার ইমামের বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হয়নি। অতিভক্তির জালে ফেঁসে যে নিষেধাজ্ঞা আল্লাহ ও রাসূল (ﷺ) থেকে তো আছেই, উপরন্তু সেই মহামান্য ইমামদের নিজের ওসিয়তের বিপরীতও মানুষ চলতে দ্বিধা করছে না। তাদের অবাধ্যতাই তাদের অনুসরণ হিসেবে সমাজে স্থান পেয়েছে। ইমামদের মতামত বা তাদের নামে সম্পৃক্ত মতামতের সামনে কুরআন হাদীসও যেন স্তান হয়ে যায়।

শরীয়তের নামে শরীয়ত বিরোধী সব কর্মের পিছনেই মানুষ একটা না একটা দলীল প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে। এই অতিভক্তির বৈধতা দেয়ার জন্য তাক্বলীদ নামের শব্দটির ভিন্ন অর্থ দাড়া করানো হয়েছে। অপব্যখ্যা করা হয়েছে কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন জায়গায়। বিভিন্ন শব্দে কুরআন হাদীসের মূল অর্থ যা নবী বা সাহাবায়ে কেবাম বুঝেছিলেন সেই অর্থ থেকে পলায়ন করে নিজের মেধাপ্রসূত অর্থ দাঁড়া করিয়ে এর বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। মানুষ আজ তাক্বলীদের বিড়ম্বনার শিকার। সাধারণ থেকে নিয়ে বিশেষ ব্যক্তিবর্গ পর্যন্ত এর জালে আটকা পড়েছেন।

যাই হোক, এই তাক্বলীদের অসারতা ও অকার্যকারিতা এবং এর পক্ষে যে সব দলীল উপস্থাপন করা হয় সারগর্ভ আলোচনার মাধ্যমে সেগুলোর অসারতা তুলে ধরে হাফেজ জালাল উদ্দীন কাসেমী যে বইটি লিখেছেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। “তাক্বলীদ কী শারঈ হাইসিয়াত, ইশকালাত আওর শুবুহাত কা ইয়ালাহ” অর্থাৎ ‘শরঈ মানদণ্ডে তাক্বলীদ, প্রশ্ন ও সংশয়ের নিরসন’ নামের মূল উর্দু বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদের গুরুত্ব অপরিসীম

দেখে বইটি বাংলাভাষীদের জন্য অনুবাদে হাত দেই। বইটি পড়লে যে কেহ অত্যন্ত উপকার পাবেন বলে আমরা শতভাগ আশাবাদী। সাধারণের চেয়ে আলেমদের জন্য বইটি আরো বেশি উপকারজনক হবে ইন্শা আল্লাহ।

প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব রীতি রয়েছে। তাই যে কোন বই লেখার চেয়ে অনুবাদ করতে আরো বেশি হিমশিম খেতে হয়। কেননা হুবহু শব্দের অনুবাদে লেখকের মর্ম অনেক ক্ষেত্রে উদ্ধার হয় না, অনেক ক্ষেত্রে জটিল হয়। আবার ভাবার্থ অনুবাদে বিষয়টি নিজ ইচ্ছেমত চমৎকারভাবে সাজানো যায় তাই এর রীতি থাকলেও অনেক সময় লেখকের উদ্দেশ্য পরিবর্তন হয়ে যায়, ফলে আমানতের খেয়ানত হয় যা প্রথম দোষ থেকে আরো অনেক ভয়ঙ্কর। তাই যথাসম্ভব হুবহু অনুবাদের চেষ্টা করা হয়েছে। এমনকি কুরআন বা হাদীসের অনুবাদের ক্ষেত্রে লেখকের অনুবাদের অনুসরণ করা হয়েছে, তবে মানুষ হিসেবে যেখানে কদাচিৎ ভুল হয়েছে সেখানকার কথা ভিন্ন। হুবহু অনুবাদের চেষ্টার কারণে ভাষাগত অসৌন্দর্য দৃষ্টিগোচর হলে তা আমার দুর্বলতা ও উপরোক্ত কারণ বলে ধরে নিবেন।

মূল উর্দু বইটি প্রকাশের পূর্বে তার তাহকীক বা পর্যালোচনা, তাখরীজ বা হাদীসের তথ্য বের করার কাজ, পুনঃদৃষ্টি ও সহজকরণ এবং সম্পদনার কাজ করা হয়েছে। একাধিক মানুষের যাচাই ও নিরীক্ষণের পর বইটি প্রকাশিত হওয়ায় পূর্বের তথ্যের উপরই নির্ভর করা হয়েছে। যেখানে যে তথ্য যেভাবে দেয়া হয়েছে সেখানে তা সেভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে।

দু'আ করি আল্লাহ বইটি থেকে সবাইকে উপকৃত করুন এবং অনুবাদ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যারা যেভাবে সহযোগিতা করেছেন সবার শ্রমকে কবুল করুন। আমীন!

বিনীত:

নুরুল আবসার

০৯/০৬/১৪৩৬ হিজরী

৩১/০৩/২০১৫ ঈসারী

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
অনুবাদের কথা	3
ভূমিকা	3
অগ্রকথা	21
তাক্বলীদ: কুরআন, হাদীস এবং সাহাবায়ে কেলাম (রাহিতুল্লাহ)দের বক্তব্যের আলোকে	25
তাক্বলীদ প্রত্যাখ্যানকারী আয়াতসমূহ	26
একটি সংশয় এবং তার নিরসন	35
হাদীসের আলোকে তাক্বলীদের প্রত্যাখ্যান	39
খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতের সঠিক মর্ম	40
মু'আয এর হাদীসের পর্যালোচনা	49
“أَصْحَابِي كَانُوا جُورًا” (আসহাবী কাননুজুম) হাদীসের পর্যালোচনা	51
সাহাবা (রাহিতুল্লাহ) এর মতামত এবং তাক্বলীদ	52
চার ইমাম এবং অন্যান্য উলামায়ে উম্মতের অবস্থান	52
আবু হানিফা (রাহিতুল্লাহ) এর বাণী	52
ইমাম মালেক (রাহিতুল্লাহ) এর বাণী	৫৪
ইমাম শাফেঈ (রাহিতুল্লাহ) এর বাণী	৫৪
ইমাম আহমাদ (রাহিতুল্লাহ) এর বাণী	৫৫
মুক্বাল্লিদ এবং জ্ঞান	56
তাক্বলীদ এক বিপদ	56
মুক্বাল্লিদ ওলী হতে পারেন না	60
ওলীদের মতাদর্শ সম্পর্কে পীর আব্দুল কাদের জিলানীর ফতোয়া	60

তাক্বলীদের কাহিনী মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহীর মুখে	60
মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (আশরাফ আলী) এর পেরেশানী	61
ইবলিসের ধোঁকা	62
তাক্বলীদ এবং যুক্তি দর্শন	63
ক্বিয়াস এবং ফিক্বহ শাফের রাস্তা	65
ইজতিহাদ এবং তাক্বলীদ	67
মুহাদ্দিসীন কি মুক্বাল্লিদ ছিলেন?	69
আমরা কি ইমাম বুখারী (আবু ইব্রাহীম আল-খালীফ) এর তাক্বলীদ করি?	71
বর্ণনা গ্রহণ করা এবং তাক্বলীদ	72
তাক্বলীদের প্রকার বিশ্লেষণ	73
জারহ (দোষ বর্ণনা) সাব্যস্ত করতে সমসাময়িক হওয়ার শর্ত	74
ব্যক্তিসত্তার তাক্বলীদ এবং চিন্তা দর্শনের দোহাই	76
মুহাদ্দিসীনে কেরামের তাসহীহ তায্ঈফ (সনদের হুকুম লাগানো) মেনে নেয়া তাক্বলীদ নয়	77
দ্বীনী বিষয়ে নবী ছাড়া অন্য কারো “রায়” গ্রহণ	78
গ্রন্থপঞ্জি	80

ভূমিকা

(ড. হাফেজ শাহবাজ হাসান)

দ্বীন এবং শরীয়তের যাবতীয় বিধান ওহীর মাধ্যমে জানা যায়। ওহী কুরআন ও হাদীসের নাম। মানুষের সমস্ত আমল কবুল হওয়া নির্ভর করে এর উপর যে, তার আমলটি যেন ওহীর বিপরীত না হয়। কেননা ওহীর বিপরীত আমল নষ্ট হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর, আর তোমাদের আমলসমূহ নষ্ট করো না।”

কিন্তু কিছু মানুষ দ্বীনের উপর আমলের জন্য তাক্বলীদের রাস্তা অবলম্বন করেছেন। এই জায়গায় তারা গৌড়ামির মাধ্যমে কাজ নিয়েছেন এবং কুরআন হাদীসের অথবা ব্যাখ্যার মাধ্যমে নিজের ফিক্বহী মতামত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। ইমাম ইবনে হাযম আন্দুলুসী (মৃত:৪৪৬ হি:) লিখেন, “তাক্বলীদ হারাম এবং কারো জন্য জায়েয নয় যে, সে আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ছাড়া কারো মতামত দলীল ছাড়া গ্রহণ করবে এবং এর উপর আমল করবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ

“(হে লোকেরা,) তোমাদের রবের পক্ষ হতে যা নাযিল করা হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ করো, আল্লাহ ছাড়া অন্য অভিভাবকদের অনুসরণ করো না।”^১

আরো বর্ণিত হচ্ছে,

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلَى نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ط
أَوَلَوْ كَانَ آبُوهُمْ لَا يَعْزِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

“আর যখন তাদেরকে বলা হয় তোমরা সে সবার অনুসরণ করো যা আল্লাহ নাযিল করেছেন। উত্তরে তারা বলে, বরং আমরা অনুসরণ করব যার উপর আমাদের পিতামহকে পেয়েছি।”^২

১. সূরা মুহাম্মাদ: ৩৩

২. সূরা আ'রাফ: ৩

যে লোকেরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) ছাড়া অন্য কারো অনুসরণ করে না তাদের প্রশংসায় আল্লাহ তা'আলা বলেন,

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْآلِبَابُ

“(হে নবী, আমার ঐ সমস্ত বান্দাদের সুসংবাদ দাও) যারা মনোযোগ দিয়ে কথা শোনে এবং এর উত্তমগুলো মেনে চলে। ঐ সব লোকদেরকেই আল্লাহ হিদায়াত দিয়েছেন এবং তারাই জ্ঞানী।”^৩

অন্য আরেক স্থানে বলেন,

فَإِنْ تَنَارَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

“যদি তোমাদের মাঝে কোন বিষয়ে ঝগড়া সৃষ্টি হয় তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করো যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান এনে থাকো।”^৪

কোন বিষয়ে ঝগড়া এবং মতভেদ সৃষ্টি হলে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) ছাড়া অন্য কারো কথা বা কর্মের দিকে প্রত্যাবর্তনের অনুমোদন দেননি।

সাহাবায়ে কেরাম, তাবিঈঈন, তাব'য়ে তাবিঈঈনদের এ বিষয়ে সর্বদা ঐক্যমত ছিল যে, এ থেকে পরিপূর্ণভাবে বিরত থাকতে হবে যে, কোন ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে ছেড়ে নিজের কোন আলেম বা ইমামের অনুসরণ করবে অথবা পূর্বের কারো কথা ও মতামতকে নিজের আমলের ভিত্তি বানাবে।

যে ব্যক্তি আবু হানিফা (রহমতুল্লাহি), মালেক (রহমতুল্লাহি), শাফেঈ (রহমতুল্লাহি) এবং আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহমতুল্লাহি) প্রমুখদের কথা ও ফতোয়াকে দলীল মানে,

৩. সূরা বাক্বারা: ১৭০

৪. সূরা যুমার: ১৮

৫. সূরা নিসা: ৫৯

তাদের অনুসরণ করে তাদের ব্যতীত অন্য কারো ফায়সালা এবং মতামতের গুরুত্ব দেয় না, সেগুলো গ্রহণ করে না, কুরআন হাদীসের উপরও সে পর্যন্ত আমল করে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে নির্দিষ্ট ইমামের কথার সাথে মিলিয়ে না নেয়, এমন ব্যক্তিকে জানা উচিত সে নিশ্চয় ইজমা'য়ে উম্মতের বিপরীত কর্মে জড়িত।

তাকে এটা জেনে রাখা উচিত যে, সে যখন প্রথম তিন উত্তম যুগে নিজের দিক নির্দেশনা ও পথপ্রদর্শনের জন্য কোন ইমাম ও অনুসরণীয় ব্যক্তি পায়নি ফলে সে মুসলিমদের রাস্তা থেকে সরে অন্য কোন রাস্তা অবলম্বন করে চলছে। এমন অবস্থা থেকে আমরা আল্লাহর আশ্রয় চাই।

এই বাস্তবতাকেও ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, স্বয়ং ফুক্বাহা এবং মুজতাহিদগণ নিজের এবং অন্য নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির তাক্বলীদ করতে নিষেধ করেছেন এবং চোখ বন্ধ করে তাঁদের পিছনে চলতে থাকার বিরোধিতা করেছেন।

এ ছাড়া একথার কোন দলীল বুঝে আসে না যে, উমার ইবনুল খাত্তাব, আলী ইবনু আবি তালিব, আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ, আবদুল্লাহ ইবনে উমার, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং উম্মুল মু'মিনিন আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) দের ছেড়ে তাঁদের পরের ফুক্বাহাদের তাক্বলীদ করতে হবে। যদি তাক্বলীদ জায়েয হয় তবে হিজরী দ্বিতীয়, তৃতীয় শতাব্দীর তুলনায় কতইনা ভাল হতো যে আকাবিরে সাহাবার তাক্বলীদ করা হবে।^৬

ইবনে হাযম (রাঃ)-এর তাক্বলীদের মতামত সম্পর্কে শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রাঃ) বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি লিখেন, ইবনে হাযম যা বলেছেন তার প্রয়োগ তিন ধরনের মানুষের উপর হতে পারে।

(১) ঐ ব্যক্তি যে ইজতিহাদের কিছু না কিছু যোগ্যতা রাখে যদিও তা একটি মাসআলায় হোক না কেন। সে ব্যক্তি এ কথা ভালভাবে জানে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) অমুক কাজের নির্দেশ দিয়েছেন অথবা অমুক কাজ থেকে নিষেধ করেছেন এবং এই মাসআলায় যে হাদীস রয়েছে তা মানসুখ

৬. ইক্বদুল জীদ ফী আহকামিল ইজতিহাদী ওয়াততাক্বলীদ, পৃষ্ঠা: ৭৯-৮১, শাহ ওয়ালিউল্লাহ, অনুবাদ ড. মুহাম্মদ মিয়া সিদ্দিকী, মুদ্রণ: ২০১২, শরীয়াহ একাডেমি, ইসলামাবাদ।

(রহিত) নয়, অবস্থা এই যে, সে ঐ মাসআলা সম্পর্কে যত হাদীস রয়েছে সবগুলো সে আয়ত্ত করেছে এবং পক্ষে বিপক্ষে যত মতামত রয়েছে সবই সে অনুসন্ধান করেছে, কিন্তু অনেক অনুসন্ধানের পরও তার কাছে সেই হাদীস রহিত হওয়ার কোন প্রমাণ মিলেনি, অথবা সে লক্ষ্য করল যোগ্য আলেমের এক দল সেই হাদীসের দিকে ধাবিত এবং তাদের বিপক্ষ মতালম্বি শুধু মাত্র ক্বিয়াস এবং ইজতিহাদকে দলীল বানিয়ে সেই হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করতে চায়, এমতাবস্থায় এছাড়া আর কী বলা যেতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হাদীসের বিরোধিতা, অন্তরের নেফাক্ এবং বাহ্যিক অজ্ঞতা।

শাইখ ইয়ুদ্দীন বিন আব্দুস সালাম (রহমতুল্লাহি) এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেন, এটা চূড়ান্ত পর্যায়ে আশ্চর্যজনক বিষয় যে, কিছু মুক্বাল্লিদ আলেম এ কথার উপর পূর্ণ অবগত হন যে, অমুক মাসআলায় তাঁর অনুসরণীয় ব্যক্তি এবং ইমামের মতামত এবং অবস্থানের দলীল এই পরিমাণ দুর্বল যে তার ব্যাখ্যার কোন শক্তি থাকে না, কিন্তু এ সব কিছু জানা ও বুঝা সত্ত্বেও সেই ইমামের তাক্বলীদ করেন এবং অন্যান্য যে সমস্ত ইমাম এবং মুজতাহিদের ফিক্বহী মতামতের উপর কুরআন, সুন্নাহ এবং সহীহ ক্বিয়াস স্পষ্ট সাক্ষ্য হয়, তথাপি নিজের নির্দিষ্ট ইমামের মতামতের উপর জমে থাকার জন্য তাদের মতামত ছেড়ে দেন।

কথা শুধু এখানেই শেষ নয়, বরং নির্দিষ্ট ইমামের মতামতের এই পরিমাণ ওকালতি করেন যে, কুরআন ও সুন্নাহর বাহ্যিক শব্দ এবং সিয়াক্ব সাবাক্বেও (অথবর্তী, পূর্ববর্তী) ব্যাখ্যা থেকে দূরে থাকেন না। নিজের ইমামের মতামতকে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠার জন্য দূর থেকে দূরের ব্যাখ্যার আশ্রয় নেন।

ইসলামের প্রথম যুগের মানুষের পদ্ধতি ও আমল ছিল, তারা কোন বিশেষ নির্দিষ্ট ফিক্বহী মতাদর্শ লক্ষ্য করা ছাড়া আলেমদের দিকে প্রত্যাভর্তন করতেন। যে মাসআলা সম্পর্কে তাদের জ্ঞান থাকত না তারা সেই মাসআলা কোন নির্ভরযোগ্য আলেমের কাছে জিজ্ঞাসা করতেন, এটা যাচাই করা ছাড়া যে, ইনি হানাফী নাকি মালেকী। আলেমরাও প্রশ্নকারীর উপর কোন আপত্তি করতেন না। কিন্তু এমন একটি সময় আসল যে, ফিক্বহী মতাদর্শের ক্ষেত্রে গোঁড়ামি সৃষ্টি হয়, মানুষদের থেকে উদার দৃষ্টিভঙ্গি যেতে থাকে। এখন মানুষ নির্দিষ্ট ইমাম এবং মুজতাহিদের

অনুসরণ করে, প্রত্যেকটি বিষয়ে চাই কোন মাসআলায় তার মত দলীল থেকে খালি হোক, এ যেন ফক্বাহ এবং মুজতাহিদকে রাসুলের স্থান দেয়া হয়েছে। এই গোঁড়ামি এবং বাড়াবাড়ি মানুষকে সত্য থেকে দূর করে দিয়েছে। এটি এমন একটি আমল পদ্ধতি যা কোন জ্ঞান এবং জ্ঞানী ব্যক্তি পছন্দ করতে পারে না।”^৭

আবু শামা (মৃত: ৬৬৫ হি.) বলেন, “যে ব্যক্তি ফিক্বাহ অধ্যয়নে লিপ্ত হয় তার জন্য উত্তম হলো, সে নির্দিষ্ট কোন ফিক্বাহী মতাদর্শের উপর সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং এটা দেখবে যে, কিভাবে এবং সুন্নাহের নিকটতম কী। মাসআলার যে দিকটি এবং ফুক্বাহায়ে কেরামের মতামতের মধ্যে যে মতটি কুরআন এবং সুন্নাহের অধিক নিকটবর্তী হবে সেটাকে নিজের বিশ্বাস ও আমলের ভিত্তি বানাবে। যে ব্যক্তি পূর্বের ইলমের উপর প্রশস্ত দৃষ্টি রাখে, কুরআন-সুন্নাহ এবং এর সিয়াক্ব সাবাক্বের মাধ্যমে মর্মের উপর অবগত হয়, একই মাসআলায় ফুক্বাহাদের বিভিন্ন মতামত থাকে এবং তারও সেটি জানা থাকে, তবে তার জন্য এটা সহজ যে সে নিজেকে কোন নির্ধারিত ফিক্বাহী মতামতের উপর সীমাবদ্ধ করবে না। অবশ্য এমন ব্যক্তির জন্য জরুরী যে, সে গোঁড়ামি থেকে দূরে থাকবে। মতামতের ভিন্নতার যে সব কারণ রয়েছে সেগুলোর চিন্তায় বিভোর হওয়া থেকে দূরে থাকবে, কেননা এগুলো সময় নষ্ট করে। এবং স্বভাবজাতে ঘোলাটে সৃষ্টি হয়। ইমাম শাফিঈ (রহমাতুল্লাহি) এর কথা নির্ভরযোগ্য সূত্রে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে যে, তিনি তাঁর এবং তিনি ছাড়াও অন্যান্য যে কোন আলেম ও ফক্বাহীর তাক্বলীদ করতে নিষেধ করেছেন।”

ইমাম শাফিঈ (রহমাতুল্লাহি) এর ছাত্র মুযানী (রহমাতুল্লাহি) (মৃত: ২৬৪ হি.) বলেন,

“আমি আমার নিজের কিভাবে ‘আল-মুখতাছারে’ ইমাম শাফিঈর ইল্ম এবং তাঁর কথাবার্তার সারাংশ বর্ণনা করেছি, যাতে করে ইমাম শাফিঈ ইল্মকে তার অনুসন্ধানকারী এবং অর্জনকারীদের জন্য নিকটবর্তী করে দেই যেন তারা দ্বীনী মাসাইলে চিন্তা ও গবেষণা করে সতর্কতার সাথে কাজ করে। কিন্তু সাথে সাথে এটাও বলে চলছি যে, ইমাম শাফিঈ (রহমাতুল্লাহি) তাঁর নিজের এবং তিনি ছাড়া অন্য কোন ফক্বাহ ও মুজতাহিদের তাক্বলীদ করতে নিষেধ করেছেন। যাই হোক, যে ব্যক্তিই ইমাম শাফিঈর ইল্ম

৭. ইক্বদুল জীদ ফী আহকামিল ইজতিহাদী ওয়াততাক্বলীদ, পৃষ্ঠা: ৮১-৮২

অধ্যয়ন করতে চায় এবং তার আশ্রয় যে ইমাম শাফিঈর ফতোয়া এবং মতামত পর্যন্ত তার জ্ঞান পৌঁছুক তার জন্য এটা স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, তিনি নির্দিষ্ট এবং নির্ধারিত এক আলেমের তাক্বলীদ করতে নিষেধ করেছেন।”৮

(২) ইবনে হাযম (রহমতুল্লাহু আলাইহ)-এর কথা ঐ সাধারণ ব্যক্তির উপরও প্রয়োগ হবে যে ফুক্বাহাদের কোন একজনের তাক্বলীদ করে এবং এটা বুঝে যে, তাঁর থেকে কোন ইজতিহাদী বিষয়ে ভুল হওয়া সম্ভব নয় এবং তিনি যে মত এবং ফতোয়া প্রদান করেছেন তা নিঃসন্দেহে বিশুদ্ধ, মনে মনে এটাও কল্পনা করে যে, সে তার তাক্বলীদ কখনো ছাড়বে না, এর বিপরীত যে কোন দলীল আসুক না কেন। কুরআন এবং হাদীসে এ ধরনের আমলের পদ্ধতির খারাবী বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) বলেন আমি রাসূলুল্লাহকে এই আয়াত পড়তে শুনি,

اِخْتَذَوْاْ اَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ

“তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বৈরাগিদেরকে প্রভুরূপে গ্রহণ করেছে।”৯

কাফেররা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আলেম এবং পাদ্রিদের ইবাদত করত না, কিন্তু তাদের উপর অন্ধ বিশ্বাস ছিল যে, যেটাকে তারা হালাল বলত সেটাকে হালাল ভাবত আর যেটাকে তারা হারাম করে দিত সেটাকে নিজের উপর হারাম করে নিত।”১০

(৩) ইবনে হাযম (রহমতুল্লাহু আলাইহ)-এর মতামত তৃতীয়ত ঐ ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট যে ব্যক্তি একথা বৈধ মনে করে না যে, হানাফী ব্যক্তি শাফিঈ ফক্বীহ থেকে ফতোয়া নিবে অথবা শাফিঈ ব্যক্তি হানাফী ফক্বীহ থেকে ফতোয়া নিবে, সে এটাও জায়েয মনে করে না যে, হানাফী মতাদর্শের ব্যক্তি ইমাম শাফিঈর অনুসরণ করবে। প্রকৃতপক্ষে এই লোকটি এমন যে প্রথম যুগের পদ্ধতি এবং সাহাবা তাবিঈগণের ইজমার বিরোধিতা করেছে।

৮. ইক্বদুল জীদ, পৃষ্ঠা: ৮২-৮৩

৯. সূরা তাওবাহ: ৩১

১০. তিরমিযী, তাফসীর অধ্যায়, হাদীস: ৩০৯৫, সনদ দুর্বল, তবে শাহেদ থাকার ফলে আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

ইবনে হায়ম (رحمہ اللہ)-এর কথা ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না যে নবী করীম (ﷺ)-এর দিক নির্দেশনা মোতাবেক দ্বীন গ্রহণ করেছে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ﷺ) যেটাকে হালাল করে দিয়েছেন সেটা হালাল হওয়ার উপর ঈমান রাখে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) যেটাকে হারাম করে দিয়েছেন সেটা হারাম হওয়ার বিশ্বাস রাখে।

কিন্তু যখন সে ব্যক্তির কাছে নবী করীম (ﷺ)-এর দিক নির্দেশনার উপর প্রশস্ত জ্ঞান থাকবে না এবং সে এটাও জানে না যে, যেখানে বাহ্যিক কিছুটা মতানৈক্য দেখা যায় নবী করীম (ﷺ)-এর এমন দিক নির্দেশনায় কী ফায়সালা হবে, তার এ জ্ঞানও নেই যে নবী করীম (ﷺ)-এর কথা থেকে কিভাবে বিধান উদ্ঘাটন করা হয়, এমন ব্যক্তি যদি কোন ভাল বিজ্ঞ আলেমের তাক্বলীদ করে, সে আলেম কোন ফতোয়া দিলে সে তাকে সত্যের উপর অধিষ্ঠিত বলে জানে এবং এই ধারণা করে যে, তিনি নবী করীম (ﷺ)-এর সুন্নাতের অনুসারী, এসবের সাথে সাথে সে প্রতিজ্ঞা রাখে যে, যদি কোন সময় আমার কাছে কোন হাদীস আসে এবং তা এই আলেমের কথা বা ফতোয়ার বিপরীত পাই তবে তাঁর কথা ও ফতোয়া ছেড়ে দিব এবং কোন ধরণের বাহাস আলোচনা ছাড়াই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা মেনে নিব। এই পদ্ধতির আমলের উপর কারো কোন অভিযোগ থাকতে পারে না। এ পদ্ধতি নবী করীম (ﷺ)-এর যুগ থেকে চলে আসছে যে, যারা আলেম তারা ফতোয়া দিতেন এবং যাদের ইল্ম গভীর ও প্রশস্ত নয় তারা তাঁদের ফতোয়ার উপর ভরসা করতেন।

অবশ্য এটা জরুরী নয় যে সব সময় একই আলেম এবং একই মুফতী থেকেই ফতোয়া নিবে, একজন আলেম এবং একজন মুফতীর কাছেই মাসআলা জিজ্ঞাসা করবে। কখনো কোন একজন আলেম থেকে ফতোয়া নিয়েছে আবার কখনো অন্য আলেম থেকে ফতোয়া নিয়ে নিলে কোন সমস্যা নেই। তবে শর্ত হলো সব আমল সেই মূলনীতির আলোকে হতে হবে যা আমরা উপরে উল্লেখ করেছি।

যদি আমরা ফুক্বাহাদের কারো একজনের তাক্বলীদ করি তবে আমরা এই মনে করে করি যে, তিনি কিতাবুল্লাহ এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাতের আলেম। তাঁর মতামত ও ফতোয়া কুরআন ও সুন্নাতের কোন স্পষ্ট হুকুম এবং উদ্ধৃতির মোতাবেক হবে, অথবা এ দুইয়ের কোন উদ্ধৃতি বা দুইয়ের মাঝে কোন একটির উদ্ধৃতি থেকে উদ্ঘাটিত হবে, অথবা সেই আলেম কুরআন ও সুন্নাতে বর্তমান আকার ইঙ্গিত থেকে কোন বিধান জেনে থাকবেন যে, এই বিধানটি অমুক অবস্থায় অমুক কারণে হয়েছে এবং তার সমস্ত পরিশ্রম চেষ্টার কারণে এ

বিষয়ে তিনি আশ্বস্ত হবেন, এর আলোকে তিনি কুরআন হাদীসে বর্ণিত নয় বিষয়কে কুরআন হাদীসে বর্ণিত বিষয়ের উপর ক্বিয়াস করবেন। তাঁর সমস্ত পরিশ্রম একথার সাক্ষ্য যে, তিনি যেন বলছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর এই হুকুম তোমরা যেখানে কারণ পাও সেখানেই প্রযোজ্য হবে এবং যে মাসআলায় ক্বিয়াস করা হলো তা সেই ব্যাপক হুকুমের অন্তর্ভুক্ত থাকবে, তাই এটাও নবী করীম (ﷺ)-এর কথার অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু তাঁর কর্ম পদ্ধতি সন্দেহ ও সংশয় থেকে মুক্ত নয়। যদি এমনটি না হতো তবে কোন ঈমানদার কোন মুজতাহিদের তাকুলীদ করতেন না।

এখন যদি আমাদের কাছে সেই ইমামের মতাদর্শের বিপরীত সহীহ নির্ভরযোগ্য সূত্রে কোন হাদীস মিলে যায় এবং আমরা হাদীস ছেড়ে ইমাম এবং মুজতাহিদের মতাদর্শকে অগ্রাধিকার দিই এবং তার উপরেই জমে থাকি তবে আমাদের চেয়ে বড় যালিম আর কে হবে? কেননা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীসের অনুসরণ আমাদের উপর ফরয আর কোন ইমাম মুজতাহিদের অনুসরণ আমাদের উপর ফরয নয়। যদি আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সূনাত ছেড়ে কোন ইমাম, ফক্বীহ, এবং মুজতাহিদের কথা ও মতামতের আনুগত্য করি তবে সেদিন কী ওজর হবে যখন আল্লাহ রাসূল আলামিনের সামনে উপস্থিত হবে এবং সেখানে শুধু আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।”

উপরে উল্লিখিত বিবরণে শাহ সাহেব যদিও তাকুলীদ শব্দ ব্যবহার করেছেন তবুও এর দ্বারা ইত্তেবা’ই উদ্দেশ্য যেমনটি তাঁর অন্যান্য কথা থেকে জানা যায়।

অনেক মানুষ ইত্তেবা’ এর বদলে তাকুলীদে পথ অবলম্বন করেছে এবং এর সহযোগিতার ধারাবাহিকতায় সন্দেহ সংশয় উপস্থাপন করে থাকে এই সমস্ত লোকদের জন্যই শাহ ওয়ালিউল্লাহ (رحمۃ اللہ علیہ) বলেছিলেন, “যদি আজ তোমরা ইয়াহুদীদের নমুনা দেখতে চাও তবে উলামায়ে ছু-দের (মন্দ আলেমদের) দেখো যারা দুনিয়া আগ্রহী, পূর্ববর্তীদের তাকুলীদ যাদের চরিত, কিতাব এবং সূনাত রাসূল (ﷺ) থেকে যারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, এক ইমামের কথাকে অন্ধ হয়ে পুরো কঠোরতার সাথে আঁকড়ে ধরেছে এবং এর বিপরীতে শরীয়ত প্রবর্তক নিষ্পাপ ব্যক্তির কথাকে বেপরোয়াভাবে ছেড়ে দিয়ে জাল হাদীস এবং অপব্যাক্যাকে নিজের অনুসরণীয় বানিয়েছে।”

১১. প্রাগুক্ত: ৮৩-৮৬

১২. আল-ফাওয়ল কাবীর, পৃষ্ঠা: ১০

কোন কোন মানুষ তাক্বলীদের সহযোগিতায় ঐ সমস্ত দলীল পেশ করেন যা ইত্তেবা'র বেলায় এসেছে। এক টেলিভিশন চ্যানেলের প্রোগ্রামের শুরুতে আহবায়করা উলামাদের ডেকে তাক্বলীদ সম্পর্কে কতিপয় প্রশ্ন করলেন। জিজ্ঞাসা করা হল, তাক্বলীদ কি কোন ধর্মীয় ফরয?

যার উত্তরে মুফতী নাবীর আহমাদ সাহেব বললেন, সাধারণ ব্যক্তির জন্য তাক্বলীদ আপন জায়গায় একটি ফরয, এই শর্তে যে, কুরআন হাদীসের কোন হুকুমের সাথে সেই মতামতের সরাসরি সংঘর্ষ হতে পারবে না। কিন্তু কোন আলেম যেমন আমি রয়েছি, আমার ইমামের মতামত কুরআন ও সুন্নাতে সাথে সাংঘর্ষিক হয়েছে এবং আমার মাঝে ইলমের গভীরতা এবং গবেষণার যোগ্যতা বিদ্যমান, যেমন আমাদের ইমাম আবু হানিফা (রাহিমাহুল্লাহ) এর মতামত হলো, যে আরবী পড়তে সক্ষম নয় সে নামাযে ফার্সিতে কিরাআত পড়তে পারে, এটি ইমাম সাহেবের মত, আমরা তাঁর এ মত মানি না, এ জন্য যে, আমরা কুরআন ও হাদীসের আলোকে এই মতামতকে উপযুক্ত মনে করি না। আহবায়ক বললেন, জরুরী নয় যে, একই সময় মানুষ একজন ইমামেরই মুক্বাল্লিদ হবে।

তাক্বলীদ ব্যাপারে এই প্রশ্ন যখন হাফেয আব্দুর রশীদ আযহার (রাহিমাহুল্লাহ) (মৃত: ১৭ মার্চ ২০১২ ঈসায়ী) থেকে জিজ্ঞাসা করা হলো তিনি তাঁর সারগর্ভ উত্তর দিলেন। লক্ষ্য করুন:

দ্বীন কিতাবুল্লাহ এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাতে নাম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যাওয়ার পূর্বেই এই আয়াত নাযিল হয়েছিল:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
الْإِسْلَامَ دِينًا

“আজ তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি এবং তোমাদের উপর নেয়ামতকে ভরপুর করে দিয়েছি এবং ইসলামকেই তোমাদের দ্বীন হিসেবে আমি সন্তুষ্ট।”^{১৩}

আজ তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। যে জিনিস নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর শেষ দিন পর্যন্ত দ্বীনের অংশ ছিল না, তারপর দুনিয়ার কোন শক্তি একে

দ্বীনের অংশ বানাতে পারে না। কিতাব এবং সুন্নাতের পুরো ভাণ্ডারের কোথাও তাক্বলীদ শব্দ আসেনি। এটা ধর্মীয় ফরয দায়িত্ব কিভাবে হতে পারে!

তাক্বলীদ এর অর্থ এই হলো, দলীল ছাড়া কারো কথা মানা অথচ আমাদের পুরো যিন্দেগী এবং মানবিক স্বভাবজাতের দাবী হলো কথার দলীল থাকা চাই। মুহতারাম মুফতী সাহেব যেমন বললেন, ইমামের মতামতকেও আমরা দেখব যে একথার ওজন (গুরুত্ব/শক্তি) আছে কি! ওজনটাই দলীল। যদি ওজন দেখতে হয় তবে তাক্বলীদের মূলেই অস্তিত্ব নেই।

এই তাক্বলীদ ধর্মীয় ফরয দায়িত্ব বা ধর্মীয় হুকুম বা দ্বীনের অংশ নয়, বরং দ্বীনের উপর আমল করার একটি পদ্ধতি যেটা মানুষের পছন্দ এসেছে এবং তারা উম্মতের ঐক্যের জন্য এটার সূচনা করেছেন। এর উল্লেখ নবী করীম (ﷺ) এবং সাহাবায়ে কেরামের জীবনে ছিল না। প্রশ্ন করা এবং প্রশ্নের জন্য দলীল চাওয়া এবং দলীলের ভিত্তি কিতাবুল্লাহ এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাতের পর্যালোচনা নেওয়া যে এটা আছে কি না, মতামতের পর্যালোচনা করা যে তা ঠিক কি না, যদি কোন মতামত অপছন্দ হয় তবে তাকে ছেড়ে দেয়া, এই সমস্ত কর্ম বলে দিচ্ছে যে, আমলের জগতে তাক্বলীদের মূলেই কোন অস্তিত্ব ছিল না। একটি শব্দ আর সেই শব্দের উপর পিড়াপিড়ি করা যেতে পারে। যদি ইজতিহাদই করতে হয় তাহলে ইজতিহাদ তো তাক্বলীদের শতভাগ উল্টো ও বিপরীত জিনিষ।

স্বভাবজাত দাবীর ভিত্তিতে শরীয়ত যে বিধান দিয়েছে তার জন্য ইত্তেবা' এবং ইত্বা'আত (অনুসরণ, আনুগত্য) শব্দ রয়েছে। ইত্তেবা' এবং ইত্বা'আত দলীলের সাথে অনুসরণের নাম।

আমি বলছি আপনি অনেক দূরে চলে গেছেন, আল্লাহ রাব্বুল ইয়যাত তাঁর বান্দাদের সম্বোধন করেছেন তাও দলীল ছাড়া নয়। নবী করীম (ﷺ)-এর সত্যতাও নিজের বান্দার নিকট হতে দলীল ছাড়া চাননি। মু'জিয়াতসমূহ হচ্ছে দলীল। অথচ নবী করীম (ﷺ)-এর নির্দেশ স্বয়ং দলীল হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষা দেয়ার জন্য কথাবার্তার সময় কুরআনের আয়াত পেশ করতেন। দলীলের মাধ্যমে কথা বলতেন।

যদি সাধারণ মানুষকে এই রাস্তায় লাগিয়ে দেয়া হয় যে, সে দলীল ছাড়া যে কোন কথা মেনে নিবে তবে তার থেকে স্বভাবজাত বিপরীত এক

নতুন জিনিস সৃষ্টি হবে এবং এটি মানুষদেরকে খারাপ পথে নিয়ে যাবে। আহবায়ক: তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন, তাক্বলীদ ইজতিহাদের বিপরীতমুখী- শায়খ বললেন, বিপরীতমুখী এবং বাস্তবে তার অস্তিত্ব নেই।

প্রত্যেক যুগের জ্ঞানীরা তাক্বলীদের বিরুদ্ধে কোন না কোন আওয়াজ অবশ্যই তুলেছেন...শাহ ওয়ালিউল্লাহ তো এই পর্যন্ত বলেছেন যে, “আমি আল্লাহর সাক্ষ্য ও তাঁর কসম দিয়ে বলছি, উম্মতের কোন ব্যক্তি যদি কোন মানুষের বেলায় এই ধারণা করে যে, এ আমার উপর যা ফরয করবে তা আমার জন্য মানা ফরয তবে এটি ইসলাম থেকে বহিস্কারকারী কথা।

আহবায়ক বললেন, ইমাম যে কথা বলেন সেটি তো কুরআন হাদীসের আলোকে বলেন তাহলে সে কথা দ্বীনের বিপরীত কিভাবে হতে পারে?

শাইখ মিষ্টি ভাষায় দ্রুতই বললেন, হ্যাঁ, এতটুকু যে, যখন আমাদের জানা থাকবে তিনি কুরআন হাদীস মোতাবেক বলছেন, আমরা তাঁর মাধ্যমে কুরআন হাদীস শিখে কুরআন হাদীসের কথা মানছি, এটার নাম ইত্তেবা‘ তাক্বলীদ নয়। তাক্বলীদ হলো দলীল ছাড়া কথা মেনে নেয়ার নাম। মুফতী নায়ীর আহমাদ সাহেব কথার মাঝখানে দখল দিয়ে বললেন, আবু হানিফা (রহমতুল্লাহি) এর সাথে তাঁর ছাত্ররা সবচেয়ে বেশি মতানৈক্য পোষণ করেছেন। ইমাম আবু ইউসুফ (রহমতুল্লাহি), ইমাম মুহাম্মাদ (রহমতুল্লাহি), এমনকি ইমাম যুফার (রহমতুল্লাহি) এরা ছিল সবচেয়ে প্রিয় ছাত্র। এর অর্থ কী? এর অর্থই তো আবু হানিফা (রহমতুল্লাহি) ব্যক্তিকে আমরা দলীল মানি না।

উস্তায মুহতারাম ড. সাহেব বললেন, আমি তো এটাই বলেছিলাম যে, দুনিয়ার কোথায়ও তাক্বলীদের অস্তিত্ব নেই।

লিংক দেখুন:

<https://www.facebook.com/photo.php?v=24080644126102>

সংকলক (জালালুদ্দীন কাসেমী হাফিয়াহুল্লাহ) তাক্বলীদের প্রত্যাখ্যানে দলীলসমূহকে সারগর্ভ নিয়মে সাজিয়েছেন। সংকলক একজন বিশ্বস্ত আলেমে দ্বীন। তিনি দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে ফারোগ সনদ অর্জনের পর ভারতের মাইসুর ইউনিভার্সিটি থেকে উর্দুতে এম, এ করেছেন। উর্দু, আরবী, ফার্সি, ইংরেজি, সংস্কৃত ইত্যাদি ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্য রয়েছে। ইলমী, আদবী

পরিবেশে তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং দ্বীনী খিদমাতকে সম্মানের সাথে দেখা হয়। সত্যসন্ধানীর জন্য এই কিতাবে দিক নির্দেশনার প্রচুর জিনিস রয়েছে।

পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত বইটি এই মুদ্রনকে তাখরীজ (হাদীসের অনুসন্ধান), গবেষণা, সহজ করণ এবং পুনঃদৃষ্টির পর প্রকাশ করা হয়েছে। তাখরীজ আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আখতার এবং তাহক্বীক মুহাম্মদ আরশাদ কামাল করেছেন। কিছু হাদীস সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে ভাই আবদুল্লাহ আলবানী (رحمہ اللہ) এর মতামত নকল করেছেন, তথাপি কোন মুহাক্কিক যদি সেই মতামতের সাথে কোন ক্ষেত্রে দ্বীমত পোষণ করেন তবে তিনি তা এভাবে উল্লেখ করে দিয়েছেন: "কোন কোন মুহাক্কিক এই হাদীসের সনদকে যঈফ বলেছেন" ইত্যাদি। এই গবেষণামূলক কাজের মাধ্যমে কিতাবের উপকারিতা, সূত্রগত নির্ভরতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সম্মানিত লেখক এবং সমস্ত সহযোগীদের এই শ্রমকে ক্ববুল করুন।

ড. হাফেজ মুহাম্মাদ শাহবাজ হাসান

সহকারী পরিচালক, মাজাল্লাহ দা'ওয়াতু-ত্তাওহীদ,

ইসলামাবাদ (পাকিস্তান)

অগ্রকথা

সাহাবা, তাবি'ঈন, তাব'য়ে তাবি'ঈন কুরআন এবং সুন্নাতকেই শরীয়ত এবং ফিক্‌হী বিধানের উৎস জানতেন। যখন তারা এমন কোন মাসআলার সম্মুখীন হতেন যা নবী করীম (ﷺ)-এর যুগে সামনে আসেনি এমন মাসআলার বিধানের ক্ষেত্রে তারা ইজতিহাদ তথা গবেষণা করতেন। হুকুমতে ইসলামী ব্যাপক বিস্তৃত হওয়ার ফলে ফিক্‌হী বিধান গবেষণার ময়দান প্রশস্ত হয়ে ফিক্‌হের চারটি উৎস হয়ে গেল; কুরআন, হাদীস, ইজমা' এবং ক্বিয়াস।

প্রথম শতাব্দীতে বর্তমানের তাক্বলীদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। শতাব্দীর শেষ দিকে ইমাম আবু হানিফা (রহিমাহুল্লাহ) এবং ইমাম মালেক (রহিমাহুল্লাহ) জনগ্রহণ করেন। এরপর ক্রমান্বয়ে ইমামদের মতাদর্শগুলোর প্রচলন হয়। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শতাব্দীর পরে এমন লোকের আবির্ভাব ঘটল যারা ইজতিহাদের দরজা বন্ধের দাবী করলেন। আলেমদের একদল তাক্বলীদের দিকে ঝুঁকে গেলেন অন্যদিকে অপরদল সুন্নাতের অনুসরণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকলেন।

প্রথমদল আলেমের সমস্ত 'ইলমী এবং 'আমলী প্রচেষ্টা চার ইমামের মতামত এবং তাদের কিতাবের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও সংক্ষেপণে ওয়াকুফ হয়ে গেলেন। কিন্তু তাক্বলীদের বিপরীত একদল সর্বদা ময়দানে অটল ছিলেন। আব্বাসী শাসনামলের অধঃপতনের পর ফিক্‌হের মধ্যে কঠিন একগুঁয়েমি সৃষ্টি হয়ে যায়। উলামায়ে ফিক্‌হের ইবারতসমূহকে ধাঁধা ও কৌতুক বানানোর মাঝে একে অপরের উপরে প্রতিযোগিতায় অগ্নি থাকা এবং শারয়ী বিধানাবলীকে খেলার সামগ্রীতে পরিণত করা হয়। ফলাফল এই দাড়াইল যে, ফিক্‌হের কিতাবাদি হিলা, কল্পিতরূপ এবং দুর্বল তাবীলে ভরপুর হয়ে গেল। অবস্থা এ পর্যন্ত গিয়ে দাড়াইল যে, তারা মানুষের সামনে এ সমস্ত জিনিসকে এই বলে পেশ করতে লাগল, এগুলোই ফিক্‌হে ইসলামী এবং চার ইমামের ফিক্‌হ যা কুরআন সুন্নাত এবং সাহাবাদের বিবরণ থেকে নেয়া হয়েছে, এগুলোর উপস্থিতিতে এখন যে ব্যক্তিই ইজতিহাদ করবে অথবা মতের দলীলে দৃষ্টি দিবে সে ফাসেক। এভাবে

কাল যত যেতে থাকে একগুঁয়েমি এবং গৌড়ামি বাড়তে থাকে এমনকি ইমামগণ এবং উলামাদের তাক্বলীদ ওয়াজিবের সিদ্ধান্ত দেয়া শুরু হয়ে গেল।

কিছু মানুষ ছোট মহাদেশ পাকিস্তান এবং হিন্দুস্তানে সাদাসিধে সরলমনা মুসলিমদেরকে তাক্বলীদের জালে ফাঁসানোর পুরো চেষ্টা ব্যয় করেছে। নিজের ইমামদের কথাবার্তা এবং মতাদর্শের দিকে দা'ওয়াত দিচ্ছে। মাওলানা আব্দুল হাই হানাফী 'আব-রাফ'উ ওয়াত-তাকমীল' কিতাবে লিখেছেন, “অনেক হানাফী শাখাগত মাসাইলে হানাফী, উসুলী (আক্বীদাগত মৌলিক) মাসাইলে মুরজিয়া অথবা যাইদী, আক্বীদার দিক থেকে হানিফিয়ার কয়েক শাখা প্রশাখা রয়েছে, কিছু শিয়া মতবাদী, কিছু মু'তযিলী মতবাদী আছে।”

জামা'আতে ইসলামের লোকেরা ইমাম আবু হানিফা (রাহমতুল্লাহু আলাইহ) এর অনুসারী হওয়ার দাবী করেন। দেওবন্দীরাও হানাফী, বেরলোভীরাও হানাফী। অথচ উভয় দলের মাঝে এ পরিমাণ বিদ্বেষ যে তাদের প্রত্যেক দল অপর দলকে বাতিল পুজারী এবং পথভ্রষ্ট আখ্যায়িত করেন।

এর মধ্যে গোমরাহ সূফীদের এক দল রয়েছে। এরা ওয়াহ্‌দাতুল ওয়াজুদ (সবকিছু মিলে একটাই অস্তিত্বের ধারণা আর সেই অস্তিত্বের নাম আল্লাহ) এর প্রবক্তা, যারা মানব তো কি, পুরো জগত যার মধ্যে প্রাণীও রয়েছে, সবকিছুকেই আল্লাহর নিজ জাত দাবী করে।

কাদিয়ানীরাও হানাফী, কেননা মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী মতাদর্শগত হানাফী ছিল।^{১৪}

সিদ্ধে কৃত্রিম কা'বা তৈরীকারী লেওয়ারী এবং কবরকে পাকাবানিয়ে যারা এর পূজা করে তারাও হানাফী। উরসের সময় মাজারে উপস্থিত হয়ে যারা হাজিরা দেয় মিরাসী, ক্বাওয়াল এবং ভান্ড এদের বেশিরভাগ হানাফী।

কিন্তু আমাদের দৃষ্টি সর্বদা একদিকে ছিল আর তা হলো কিতাব ও সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা। আজও আমরা দা'ওয়াত দেই যে, ব্যক্তিগত

১৪. তাক্বীকুল কুরআন, শাইখ ইয়াকুব আলী তুরাব আহমাদী, ১/২৪, মিনায-যুলুমাতি ইলাননুব, পৃষ্ঠা: ৯২-৯৩, মাকতাবা ইলমিয়াহ, লেক রোড, লাহোর

মতাদর্শ এবং স্থবীর তাক্বলীদ থেকে মানুষের মেধাকে রক্ষা করা হোক। এই কিতাব লিখার উদ্দেশ্য এটাই যে, একক ব্যক্তির তাক্বলীদের প্রভাব ও পরিণতি থেকে মানুষদের সতর্ক করা এবং তাদেরকে কিতাব এবং সুন্নাতের দিকে ফিরিয়ে নেয়া।

এর প্রচারে যে সমস্ত বন্ধুবান্ধব এবং মুহ্তারাম উলামায়ে কেরাম তথ্যসন্ধান, গবেষণা, পুনঃদৃষ্টির জন্য চরম পরিশ্রম দিয়েছেন আমি তাদের অশেষ কৃতজ্ঞ এবং তাদের জন্য দু'আ প্রার্থী যে, আল্লাহ যেন তাদের কাজের উত্তম প্রতিদান দেন। আল্লাহ আমাদেরকে কিতাব এবং সুন্নাতের উপর জীবিত রাখুন এবং এর উপর মৃত দিন। সৎ ব্যক্তিদের দলের সাথে হাশর করে জান্নাতুল ফিরদাউসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সান্নিধ্য দান করুন। আমীন।

হাফেজ জালালুদ্দীন ক্বাসেমী।

তাক্বলীদ: কুরআন, হাদীস এবং সাহাবায়ে কেরাম (رضي الله عنهم)-দের
বক্তব্যের আলোকে

তাক্বলীদের অর্থ:

তাক্বলীদ এমন অনুসরণের নাম যা চিন্তা ও অনুসন্ধান থেকে মুক্ত হয়।
আল্লামা সুবকী লিখেন:

التَّقْلِيدُ: أَخْذُ الْقَوْلِ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةٍ دَلِيلِهِ

“কারো কথাকে তার দলীল ছাড়া গ্রহণ করে নেয়ার নাম
তাক্বলীদ।”^{১৫}

আল্লামা বাহরুল উলূম বলেন,

التَّقْلِيدُ: الْعَمَلُ بِقَوْلِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ

“অন্যের (নবী ﷺ) ব্যতীত) কথার উপর দলীল ছাড়া আমল
করা।”^{১৬}

যখন নাকি ইত্তেবা‘ দলীলের ভিত্তিতে করা হয়। যেমন আবু আব্দুল্লাহ
বিন খায়মান্দাদ মালেকী বলেন,

التَّقْلِيدُ مَعْنَاهُ فِي الشَّرْعِ الرَّجُوعُ إِلَى قَوْلِهِ لَا حُجَّةَ لِقَائِلِهِ وَذَلِكَ
مَمْنُوعٌ مِنْهُ فِي الشَّرِيعَةِ وَالْإِتِّبَاعُ مَا ثَبَتَ عَلَيْهِ حُجَّةٌ.

“তাক্বলীদের শরয়ী অর্থ এই যে, এমন ব্যক্তির দিকে প্রত্যবর্তন করা
যার কথার দলীল নেই। শরীয়ত এ থেকে বাধা দিয়েছে। আর ইত্তেবা‘
হলো যেটা দলীল দ্বারা প্রমাণিত।”^{১৭}

অর্থাৎ: তাক্বলীদ দলীল ছাড়া হয় এবং ইত্তেবা‘ দলীল সহকারে হয়,
তথা কোন আলেমের মতকে দলীল ছাড়া যে মেনে নেয় সে মুক্বাল্লিদ আর
নিজের বুঝ অনুযায়ী তাঁর থেকে দলীলের অনুসন্ধানকারী মুত্তাবি‘।

১৫. শারহ জামউল জাওয়ামে‘ ২/২৫১

১৬. মুসাওয়াস সুবূত, নাওল কিশওয়ার মুদ্রিত ২৬৪ পৃষ্ঠা

১৭. ই‘লামুল মুওয়াক্কিয়ীন লি ইবনিল কাইয়াম ১/২০৮

মুগতানিমুল হুসুল কিতাবে ফাযেল ক্বান্দাহারী বলেন,
 التَّقْلِيدُ الْعَمَلُ بِقَوْلِ مَنْ لَيْسَ قَوْلُهُ مِنَ الْحُجَجِ الشَّرْعِيَّةِ بِلَا حُجَّةٍ،
 فَالْجُوعُ إِلَى النَّيِّ وَإِلَى الْإِجْمَاعِ لَيْسَ مِنْهُ.

“তাক্বলীদ: ঐ ব্যক্তির কথার উপর দলীল ছাড়া আমল করা যার কথা শরীয়তে দলীল নয়, অতএব নবী (ﷺ) এবং ইজমা‘র দিকে প্রত্যাবর্তন করা তাক্বলীদ নয়।”

প্রকাশ থাকে যে, নিচের আলোচনায় তাক্বলীদ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তাক্বলীদের যে সব অনুসারীরা আসলাফ (পূর্ববর্তী), বাপ-দাদা এবং বুয়ুর্গদের কথা ও কাজকে নিজের মতাদর্শ এবং আমলের নীতি বানিয়ে রেখেছে এবং তার বিপরীত কিতাব এবং স্পষ্ট সহীহ সুন্নাতেকে পরিস্কারভাবে অস্বীকার করে অথবা নিজের নিস্তোজ ব্যাখ্যার আড়ালে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আর যে ব্যক্তি না জানার ফলে অনভিজ্ঞ আলেমের কাছে জিজ্ঞাসা করে কোন মাসআলার উপর আমল করেছে এবং পরে অন্য কোন আলেম থেকে সুন্নাতে সহীহার ইল্ম হয়েছে এবং প্রথম আমল তা ছেড়ে দিয়ে কিতাব ও সুন্নাতের উপর আমল করেছে এমন ব্যক্তি নিম্নোক্ত আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নয়।

তাক্বলীদ প্রত্যাখ্যানকারী আয়াতসমূহ

১.

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي
 أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

“তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না তাদের পরস্পরের বিবাদে তোমাকে ফায়সালাকারী না বানিয়েছে, অতঃপর যখন তুমি ফায়সালা দিবে তখন মনে কোন সংকীর্ণতা না রেখে তা মাথা পেতে মেনে নিবে।”^{১৮}

ব্যাখ্যা: এই আয়াত এ বিষয়টি বুঝায় যে, প্রকৃত ঈমান ঐ ব্যক্তির অর্জন হয়েছে যে আল্লাহ এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)কে নিজের মনের উপর ফায়সালাকারী বানিয়েছে। কথায়, কাজে, যে কোন কিছু অবলম্বন করতে বা ছেড়ে দিতে, ভালবাসায়, শত্রুতায়। আল্লাহ শুধু এখানেই বলে শেষ করেননি বরং ঐ ব্যক্তির ঈমানকে নাকচ করে দিয়েছেন যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)কে নিজের হাকিম (ফায়সালাকারী) মানেনি, অথবা মেনেছে কিন্তু মানার মাঝে মনে সংকীর্ণতার ছাপ রয়ে গেছে। বরং এই নাকচের উপর নিজের প্রতিপালক কসম করেছেন যা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে তার মেহেরবানী এবং লালন পালনের বিশেষত্ব রাখে। এমন বলেননি, ‘প্রতিপালকের কসম’ বরং বলেছেন, ‘তোমার প্রতিপালকের কসম’। অতএব এখানে কসম রয়েছে আবার যে কথার উপর কসম করেছেন সে বিষয়টিও দৃঢ় হয়েছে। কেননা আল্লাহ জানেন মনের ভিতর কী জিনিস বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে। অর্থাৎ জয় ও সাহায্যের ভালবাসা সব সময় থাকে। চাই নিজের অধিকার অন্যের উপর থাকুক বা অপরের অধিকার নিজের উপর থাকুক।

এখানে এ বিষয়টিও প্রকাশ করা হয়েছে, নবী করীম (ﷺ)-এর উপর আল্লাহর অনেক দয়া এই যে, নবী করীম (ﷺ)-এর হুকুমকে আল্লাহ তাঁর নিজের হুকুম এবং নবী করীম (ﷺ)-এর সিদ্ধান্তকে তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত সাব্যস্ত করেছেন। অতঃপর বান্দার উপর নবী করীম (ﷺ)-এর হুকুমকে মানা এবং তাঁর আনুগত্য করাকে ওয়াজিব করে দিয়েছেন এবং ঈমান আনা গৃহীত নয় বলে আখ্যায়িত করেছেন যতক্ষণ না নবী করীম (ﷺ)-এর বিধানাবলী মেনে নিয়েছে। কেননা যখন নবী করীম (ﷺ)-এর গুণাবলীতে একথা বলে দেয়া হয়েছে তিনি নিজ প্রবৃত্তির আলোকে কিছু বলেন না, যা তিনি বলেন তা ওহী ছাড়া অন্য কিছু নয়, অতএব নবী করীম (ﷺ)-এর হুকুম আল্লাহর হুকুম, নবী করীম (ﷺ) এর ফায়সালা আল্লাহর ফায়সালা।

এরপর আল্লাহ তা‘আলা কেবল বাহ্যত ফায়সালাকারী বানিয়ে নেয়ার উপর ক্ষান্ত হননি যে এতেই মুসলমান হয়ে যাবে, বরং এই শর্ত আরোপ

করছেন যে, মনে কোন সংকীর্ণতা আসতে পারবে না, চাই বিধানটি তার পক্ষে হোক বা বিপক্ষে হোক।

যুবাইর (রাঃ) এবং আরেক ব্যক্তির মাঝে ক্ষেতে পানি সেচ দেয়া নিয়ে ঝগড়া সৃষ্টি হয়েছিল, বিষয়টি নবী করীম (সঃ) পর্যন্ত পৌঁছে গেল, বর্ণিত অবস্থার নিরীক্ষার পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) যে ফায়সালা দিয়েছিলেন ঘটনাক্রমে তা যুবাইরের পক্ষে ছিল, তাই সেই দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে উঠল, তিনি এই ফায়সালা যুবাইর (রাঃ) তাঁর ফুফাতো ভাই হওয়ার কারণে দিয়েছেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাখিল হয়।^{১৯}

লক্ষ্যণীয়: এই আয়াতের শানে নুযুলে সাধারণত এক ইয়াহুদী এবং এক মুসলিমের ঘটনা বর্ণনা করা হয় যে, এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর মীমাংসা করে দেয়ার পরও উমার (রাঃ) কাছে মীমাংসার জন্য যায়। যার কারণে উমার (রাঃ) মুসলিম ব্যক্তির মস্তক উড়িয়ে দিয়েছেন।^{২০} কিন্তু এই ঘটনার সূত্র অশুদ্ধ, হাফয ইবনে কাসীরও বিষয়টি পরিস্কার করেছেন।

আয়াতে এই সতর্কতা রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কথা বা ফায়সালায় সাথে মতবিরোধ তো দূরের কথা মনে সংকীর্ণতা অনুভব করাটাও ঈমানের বিপরীত। এই আয়াতে হাদীস অস্বীকারকারীদের এক মুহূর্ত চিন্তা তো আছেই, মুকাল্লিদদের জন্যও একটি মুহূর্ত চিন্তার বিষয় এই যে, ইমামের যে কথার বিপরীত সহীহ হাদীসের ক্ষেত্রে শুধু সংকীর্ণতাই নয় বরং তাকে মানতে অস্বীকার করে দেন অথবা তার ব্যাখ্যা করে বা বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদেরকে দুর্বল বিশ্বাস করিয়ে তাকে খণ্ডনের জন্য অপচেষ্টায় লিপ্ত হন। যার একাধিক উপমা দেয়া যেতে পারে।

২.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

১৯. বুখারী, তাফসীর, সুরা নিসার তাফসীর... 'فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ...' হাদীস: ৪৫৮৫

২০. আসবাবুন নুযুল, ওয়াহিদী: ৩৩৩

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের যারা নেতা তাদের। অতঃপর তোমাদের পরস্পরের মাঝে যদি কোন বিষয়ে ঝগড়ার সূত্রপাত হয় তবে তোমরা তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে নিয়ে যাও যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতের দিনের বিশ্বাসী হয়ে থাক। এটাই (তোমাদের বেলায়) উত্তম এবং সুন্দরতম মর্মকথা।”^{২১}

এই আয়াতে লক্ষ্য করুন, আল্লাহর সাথে ‘أَطِيعُوا’ শব্দ, রাসূলের সাথে ‘أَطِيعُوا’ শব্দ রয়েছে, কিন্তু উল্লিখিত আম্র এর সাথে ‘أَطِيعُوا’ শব্দ নেই। এ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য স্বতন্ত্র, কিন্তু নেতৃবর্গ ও আলেমদের অনুসরণ শর্তসাপেক্ষ। এ থেকে এটাও জানা যায় যে, কুরআনের মত রাসূল ﷺ-এর হাদীসও ইসলামী বিধানাবলীর স্বয়ংসম্পন্ন উৎস।

এই আয়াত থেকে জানা গেল, যে কোন মাসআলায় যদি মতভেদ সৃষ্টি হয়ে যায় তবে আল্লাহ এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। স্পষ্ট যে, এই দিক নির্দেশনা শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবিত থাকাকালীন সময়ের জন্য সীমাবদ্ধ নয়। কেননা মতভেদ সৃষ্টি হওয়ার বেশি সম্ভাবনা তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের পরেই হতে পারে। আয়াত স্বয়ং সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এর সম্পর্ক ভবিষ্যতের সাথে।

আয়াতে ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ এর পর ‘أُولِيَ الْأَمْرِ’ শব্দের উল্লেখ করা হয়নি যা একথার উপর স্পষ্ট প্রমাণ যে, ‘أُولِيَ الْأَمْرِ’ (নেতৃবর্গ, হুকুমদাতাবৃন্দ, উলামা) বিধানের কেন্দ্রস্থল হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে দুইনের মধ্যে পৃথক কোন মর্যাদা রাখেন না। স্বতন্ত্র অধিকার কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর।

﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ বলে একথা বলে দেয়া হয়েছে যে, পরস্পর বিবাদে ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ (কুরআন এবং হাদীস) এর দিকে প্রত্যাবর্তন কোন ক্ষুদ্র শাখাগত মাসআলা নয় বরং ঈমানের শর্ত।

﴿ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ বলে সতর্ক করা হচ্ছে যে, খবরদার! মতভেদের সমাধান তোমরা কুরআন এবং সুন্নাহ ছাড়া অন্য কোথাও হতে অনুসন্ধান না করা, নচেৎ তোমাদের কল্যাণ নেই এবং এর পরিণাম ভাল হবে না।

৩.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنْفِقِينَ
يُضْذَوْنَ عَنْكَ ضُذُودًا

“আর যখন তাদেরকে বলা হয়, এসো আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে, তখন আপনি মুনাফিকদের দেখবেন তারা আপনার কাছ থেকে পুরোপুরিভাবে মুখ ফিরিয়ে সরে যাচ্ছে।”^{২২}

কেননা মুমিনের অবস্থা তো এই যে,

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ
يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

“ঈমানদারদের কথা তো কেবল এই হয় যখন তাদেরকে তাদের মধ্যে মীমাংসা করার জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয় তখন তারা বলবে, আমরা শ্রবণ করলাম এবং মেনে নিলাম।”^{২৩}

তারা না রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আহবান থেকে মুখ ফিরায়ে, না সমাধানের জন্য তৃতীয় কোন জায়গায় যায়।

৪.

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ
وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ
(২১)

২২. সূরা নিসা : ৬১

২৩. সূরা নূর : ৫১

“তারা আল্লাহকে ছেড়ে আপন আপন পণ্ডিত ও সন্যাসীদেরকে এবং মারইয়াম তনয় ঈসাকে প্রতিপালক বানিয়ে নিয়েছে, অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল কেবলমাত্র এক মা’বুদের ইবাদত করার জন্য। তিনি ছাড়া কোন মা’বুদ নেই। তারা যে শরীক করে তা থেকে তিনি পবিত্র।”^{২৪}

এই আয়াতের তাফসীর আদী বিন হাতিম (রাঃ) এর এই হাদীস থেকে হয়ে যায়:

”عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ يَا عَدِي إِطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَثْنَ وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةِ ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ قَالَ أَمَّا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحْلَوْا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحْلَوْهُ وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ.”

“আদি ইবনে হাতিম বলেন, আমি নবী (সঃ)-এর কাছে আসলাম যে অবস্থায় আমার গলায় স্বর্ণের ত্রুশ ছিল। নবী করীম (সঃ) বললেন, হে আদী, তোমার গলা থেকে এই প্রতিমা ফেলে দাও। আর আমি রাসূলকে সূরা তাওবার এই আয়াত পড়তে শুনলাম “তারা আল্লাহকে ছেড়ে আপন আপন পণ্ডিত ও সন্যাসীদেরকে প্রতিপালক বানিয়ে নিয়েছে” তো রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, তারা তাদের ইবাদত করত না, কিন্তু তারা যখন কোন জিনিস হালাল করত তখন তারা সেটা হালাল বলে বুঝে নিত আর যখন কোন জিনিস হারাম করত তখন তারাও সেটা হারাম বলে বুঝে নিত।”^{২৫}

৫.

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا.

২৪. সূরা তাওবাহ : ৩১

২৫. তিরমিযী, তাফসীর, সূরা তাওবাহ হা: ৩০৯৫; সনদ যঈফ, তবে শাওয়াহেদ থাকার ফলে আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

“যে ব্যক্তি এই দুনিয়ায় অন্ধ ছিল সে আখিরাতেও অন্ধ থাকবে, আর সে অধিক বিপথগামী।”^{২৬}

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহমাহুল্লাহ) বলেন,

“وَلَا تَقْنَعُوا بِالتَّقْلِيدِ، فَإِنَّ ذَلِكَ عَمَى فِي الْبَصِيرَةِ.”

“তাক্বলীদের উপর ভরসা করো না, তাক্বলীদ ধীশক্তিকে অন্ধ করে দেয়।”^{২৭}

উল্লিখিত আয়াতে **أَعْمَى** অর্থাৎ অন্ধ দ্বারা উদ্দেশ্য চোখের অন্ধ নয় বরং ধীশক্তির অন্ধ। অর্থাৎ যে দুনিয়াতে ধীশক্তির অন্ধ হবে সে আখিরাতেও অন্ধ হবে অর্থাৎ আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত থাকবে।

৬.

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ

اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (১২-ইوسف: ১০৮)

“আপনি বলুন, এটাই আমার রাস্তা, আমি মানুষদেরকে আল্লাহর পথে ডাকি জ্ঞানের ও দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তিতে, আমি এবং আমার অনুসারীরা। আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।”^{২৮}

তাক্বলীদ জ্ঞানশক্তির বিপরীত জিনিস, আর দুই বিপরীতমুখী বস্তু একত্রিত হওয়া অসম্ভব। একই ব্যক্তি জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন এবং মুক্বাল্লিদ হতে পারে না। কেননা বাসিরাত শব্দের অর্থ হলো: স্পষ্ট দলীল প্রমাণ। তাফসীরে মাদারিকে রয়েছে,

أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَيُّ أَدْعُو إِلَى دِينِهِ مَعَ حُجَّةٍ وَأَضْحَةٍ غَيْرِ عَمِيَاءَ

২৬. সূরা বানী ইসরাঈল : ৩১

২৭. মীযান কুবরা লিশ্-শা'রানী ১/১০

২৮. সূরা ইউসুফ: ১০৮

অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে দ্বীনের দিকে দলীল ছাড়া ডাকি না এবং আমার দা'ওয়াতের মাঝে কোন অন্ধত্ব নেই।^{২৯}

আর তাক্বলীদ, যা অভিধান থেকে জানা যায়, এমন বস্তু যাতে দলীল প্রমাণ থাকে না। অতএব প্রমাণ হলো যে, তাক্বলীদ জ্ঞানশক্তির বিপরীত বস্তু। আর কুরআনে বাসিরাতকে উম্মতের জন্য অপরিহার্য করে দেয়া হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্যেও। উল্লিখিত আয়াতের অনুবাদে আরেকবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন।

“বলে দিন, এটা আমার রাস্তা, আমি আল্লাহর দিকে ডাকি পুরো বুঝে শুনে, আমি এবং যে আমার অনুসরণের উপর রয়েছে।” আমি কারো তাক্বলীদের উপর নই এবং আমার উম্মতও কারো মুক্বাল্লিদ নয়, বরং আমরা সবাই স্পষ্ট দলীল প্রমাণের উপর দণ্ডায়মান।

৭.

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾

“তিনি সেই সত্তা যিনি নিরক্ষরদের মাঝে তাদের একজনকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন, যিনি তাদেরকে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনান এবং তাদেরকে পবিত্র করেন, তাদেরকে কিতাব ও জ্ঞান শিক্ষা দেন, যদিও তারা ইতোপূর্বে ঘোর পথভ্রষ্টতায় নিপতিত ছিল।”^{৩০}

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে অশিক্ষিত মানুষদের মাঝে পাঠানো হয়েছে। তারা কুরআন হাদীস বুঝে নিয়েছে। যেখানে বুঝে আসেনি জিজ্ঞাসা করে বুঝে নিয়েছে।

এখানে মুক্বাল্লিদদের কথা এই যে, মুখ্য তো দূরের কথা আলেম ফাযেলও কুরআন হাদীস বুঝতে পারবে না। এর পরিষ্কার অর্থ এই, আল্লাহ এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কথা এত কঠিন যা বুঝতে সমস্ত উম্মত অক্ষম। হ্যাঁ তবে চার ইমামের কথা এত সহজ পরিষ্কার ছিল যা প্রত্যেক

২৯. সূত্র, তাফসীরে জালালাইন, পৃষ্ঠা: ১৯৩

৩০. সূরা জুমুআহ ২

মানুষ বুঝতে পারে। যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর কথা বুঝার ক্ষমতা বিলিয়ন মানুষের মাঝে মাত্র চার জনের হয়েছে।

যেখানে আবু হানিফা (রাহিমাহুল্লাহ) নিজে চৌদ্দ মাস আলায় নিরব থেকেছেন, যেমনটি রদে মুহতারে রয়েছে।

৮.

﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾

“যা তোমাদের কাছে নাযিল করা হয়েছে (কুরআন এবং হাদীস) তোমরা তার অনুসরণ কর। ইহা ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির অনুসরণ করো না।”^{৩১}

কুরআন হাদীসের বিপরীত কোন ইমাম, মুজতাহিদ, আলেম, পীর, ফকীর ইত্যাদির অনুসরণ করিও না। অর্থাৎ কুরআন হাদীসের বিপরীত কারো মতামত এবং ক্বিয়াসের উপর চলো না। বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে ইসলামের আঁচল হাত থেকে ছেড়ো না।

৯.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ط
أُولَئِكَ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ (১১)

“আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা তার অনুসরণ কর যা আল্লাহ নাযিল করেছেন। তারা বলে, বরং আমরা অনুসরণ করব ঐ জিনিসের যার উপর আমাদের বাপদাদাকে পেয়েছি। শয়তান যদি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তির দিকে ডাকে, তবুও কি?”

এই আয়াত বলে দিচ্ছে যে, কুরআন ও হাদীসের বিপরীত কোন দলীল প্রমাণ ছাড়া যে রাস্তা অবলম্বন করা হয় তা শয়তানের রাস্তা। যখন নিজ পিতামহের স্ববির মুক্বাল্লীদিনদের কাছে নিজের তরিকার আল্লাহ প্রদত্ত কোন সনদ নেই, বাপ দাদার অন্ধ অনুসরণ ছাড়া কোন দলীল নেই, তখন আল্লাহ তা’আলা ফায়সালা করে দিয়েছেন যে, তাদের বাপ দাদা ধারণা ও

অনুমানমূলক যে মতাদর্শ পোষণ করত তারা মূলতঃ শয়তানের আহ্বানের উপর লাব্বাইকা বলে সেই রাস্তার উপর চলত। তাদের পরিচালক শয়তান ছিল, যে তাদেরকে দোষখের আঘাবের দিকে ডাকছিল। এই ব্যাখ্যা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, কুরআন এবং হাদীস ছাড়া যেসব মতামত, কর্ম, আকাইদ, দৃষ্টিভঙ্গি এবং পথ রয়েছে সব শয়তানের দাওয়াত।

কিন্তু আক্ষেপ! আজ মানুষের কী অবস্থা? ব্যাপকহারে এই বিশ্বাস যে, চার মাসহাব সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তার যে কোন একটির উপর চলা আবশ্যিক চাই তা কুরআন হাদীসের যতই বিপরীত হোক না কেন।

একটি সংশয় এবং তার নিরসন

কেউ যেন এই ধারণা না করে যে, এই আয়াত এবং এ জাতীয় আরো যা আয়াত রয়েছে সব কাফের এবং মুশরিকদের অনড় তাকুলীদের বর্ণনায় এসেছে, আর আমরা তো মুসলিম। এই আয়াত এবং এ জাতীয় আয়াতের আমাদের সাথে কী সম্পর্ক?

প্রকাশ থাকে যে, সূত্র হলো ‘الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ’ শব্দের ব্যাপকতা প্রযোজ্য হয়ে থাকে, বিশেষ কারণ প্রযোজ্য হয় না। একে পরিস্কার এভাবে বুঝুন যে, মিথ্যা বলা যদি কাফেরদের জন্য নিষেধ ছিল তবে তা আমাদের জন্যও নিষেধ। শির্ক, কুফর, ওয়াদা ভঙ্গ, আমানতের খেয়ানত, চুরি, অশ্লীলতা ইত্যাদি সব যেমন তাদের জন্য নিষেধ ছিল আমাদের জন্যও হারাম এবং নিষেধ।

এমনিভাবে তারা নিজের বাপ দাদার কথা, কর্ম, বিশ্বাসকে দ্বীন এবং শরীয়ত নাম দিয়ে উপস্থাপন করত। আল্লাহ তাদেরকে নিষেধ করলেন এমনটি করো না, আল্লাহ প্রদত্ত সত্যায়ন মোতাবেক কাজ করো।

এভাবে এই আয়াতের আলোকে আমাদের জন্যেও এটা অপরিহার্য যে, আমরা যেন নিজের বুয়ুর্গদের, ইমামদের অপ্রমাণিত ভিত্তিহীন কথার উপর আমল না করি। শুধুমাত্র কুরআন এবং হাদীসের উপর আমল করি।

১০.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ط
أُولَئِكَ كَانَ أَبُوهُمُ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (১৭০)

“আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা সেই জিনিসের অনুসরণ কর যা আল্লাহ নাযিল করেছেন। তারা বলে, বরং আমরা অনুসরণ করব ঐ জিনিসের যার উপর আমাদের বাপদাদাকে পেয়েছি। যদিও তাদের বাপদাদারা কিছু বুঝে না এবং সঠিক পথে থাকে না, তারপরও কি?”^{৩২}

এই আয়াতে তাক্বলীদকে অকার্যকর করতে দু’ভাবে ইঙ্গিত রয়েছে; প্রথমত: মুক্বাল্লিদকে জিজ্ঞাসা করা হবে, আপনি যার তাক্বলীদ করছেন সে আপনার জ্ঞানে সঠিকের উপর আছে কি না, যদি তার জানা মতে সে সঠিকের উপর নেই তবে বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বে কেন তার তাক্বলীদ করেন? আর যদি জানেন তবে কোন দলীলের ভিত্তিতে? যদি অন্যের তাক্বলীদের ভিত্তিতে জানেন তবে সেখানেও একই প্রশ্ন করা হবে।

দ্বিতীয়ত: মুক্বাল্লিদকে জিজ্ঞাসা করা হবে, আপনি যার তাক্বলীদ করেন যদি সেও তাক্বলীদের মাধ্যমে জানে তবে সে এবং আপনি সমান, প্রাধান্য দেয়ার যুক্তি কী যে তার তাক্বলীদ করবেন? যখন দলীল দিয়ে জানলেন তখন তাক্বলীদ শেষ হয়ে গেল, আপনি তাকে দলীল দিয়ে জানুন।

১১.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ط إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (১)

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রণী হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞানী।”^{৩৩}

৩২. সূরা বাক্বারাহ : ১৭০

৩৩. সূরা হুজুরাত : ১

এর মর্ম হলো, দ্বীনের ব্যাপারে তোমরা নিজের পক্ষ হতে কোন সিদ্ধান্ত নিও না এবং নিজের বুঝ ও মতামতকে প্রাধান্য দিও না, বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর অনুসরণ করো। নিজের পক্ষ থেকে দ্বীনের বৃদ্ধি করা বা বিদ'আত সৃষ্টি করা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর সামনে অগ্রণীর দুঃসাহ ০.০০ সিকতা। কুরআন-হাদীসের দলীল অনুসন্ধান না করে কোন ফতোয়া দিবে না এবং দেয়ার পর যদি দেখা যায় ফতোয়াটি শরয়ী স্পষ্ট বিবরণের বিপরীত তবে তার উপর পিড়াপিড়ি করাও এই আয়াতের হুকুমের বিরোধী। মুমিনের অবস্থা তো হলো আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর হুকুমের সামনে মাথা নত করে দিয়ে তার অনুকরণ করা, এর বিপরীত নিজের কথা বা নিজের ইমামের মতামতের উপর জমে থাকা নয়, এটাও তাক্বওয়ারও বিরোধ।

১২.

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ج (৫১) إِذْ قَالَ لِأَيُّهَا
وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَكِفُونَ (৫২) قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا
عَابِدِينَ (৫৩)

“আর ইতোপূর্বে আমি ইব্রাহীমকে দিয়েছিলাম সঠিক পথের জ্ঞান এবং আমি তাঁর বিষয়ে সম্যক অবগত ছিলাম। স্মরণ করো যখন তিনি তাঁর পিতা এবং তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, এ মূর্তিগুলো কী, যাদের পূজায় তোমরা লিপ্ত আছো। তারা বলল, আমরা আমাদের বাপদাদাকে এদের উপাসনা করতে দেখেছি।”^{৩৪}

যখন ইব্রাহীম (আলৈহিস সালাম)-এর সম্প্রদায় নিজের শিরকী অবস্থানের সঠিকত্বের উপর কোন প্রমাণ দিতে পারল না তখন পূর্বের বুয়ুর্গদের তাকুলীদের আশ্রয় নিল। এই অবস্থাই বর্তমান ইসলাম ধর্মের মাঝে মুক্বাল্লিদদের। যখন ক্বিয়াস এবং বিজ্ঞতা দিয়ে তাদেরকে খণ্ডন করা হয় তখন তারা এই ওজর পেশ করেন যে, আমরা কী করব, আমাদের ইমাম সাহেব এটাই বলে গেছেন।

৩৪. সূরা আশ্বিয়া : ৫১-৫৩

১৩.

﴿وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ﴾

“ঐ ব্যক্তির রাস্তার অনুসরণ কর যে আমার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে।”৩৫

এই আয়াত থেকে কেউ কেউ ব্যক্তি তাক্বলীদে দলীল বের করেছেন। প্রমাণভঙ্গি এই যে, আয়াতে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারীর অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং ইমাম আবু হানিফা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। অতএব তাঁর তাক্বলীদ এই আয়াত থেকে প্রমাণ হয়ে গেল।

প্রথম উত্তর: প্রত্যেক মুমিন আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। তাফসীর ইবনে কাসীর ‘مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ’ এর তাফসীর মুমিন দ্বারা করেছেন। অতএব তাদের ব্যাখ্যা মোতাবেক আয়াতের অর্থ এই হলো, প্রত্যেক মুমিনের তাক্বলীদ করা ওয়াজিব। এ থেকে একক ব্যক্তি তাক্বলীদ কোনক্রমে প্রমাণ হয় না।

দ্বিতীয় উত্তর: আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারীর রাস্তার অনুসরণ কর, এখানে কোথায় আছে তাঁর অনুসরণ কর। কোথায় ব্যক্তির অনুসরণ আর কোথায় রাস্তার অনুসরণ যার উপর সে চলবে। রাস্তায় চলাকালীন অবস্থায় মানুষ ভুল করতে পারে, সে তো ভুলের পুতুল। মুজতাহিদ থেকেও ভুল হয় আবার সঠিক কথাও বলেন। অতএব তাঁর সত্তার অনুসরণে ভুলের সম্ভাবনা বিদ্যমান। কিন্তু যে রাস্তায় তিনি চলছেন সেই রাস্তা ভুল নয়, কেননা সমস্ত আল্লাহ ওয়ালার রাস্তা সঠিক রাস্তা। অতএব আয়াতে সিরাতে মুস্তাকীমের উপর চলার নির্দেশ ব্যক্তি তাক্বলীদের নির্দেশ নয়।

তৃতীয় উত্তর: দ্বীনের ইমামরা তাদের তাক্বলীদ করতে নিষেধ করেছেন, অতএব তাদের রাস্তার অনুসরণ এটাই যে, তাক্বলীদ করা যাবে না। বরং যে রাস্তার (কিতাব এবং সুন্নাহ) উপর তারা চলেছেন তার উপর চলতে হবে, তারাও এর উপর চলারই নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

হাদীসের আলোকে তাক্বীদের প্রত্যাখ্যান

"عَنْ الْعِرْبَاضِ ابْنِ سَارِيَةَ يَقُولُ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَوَعظَنَا مَوْعِظَةً دَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجَلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةٌ مُودَّعٌ فَأَعْهَدِ إِلَيْنَا بِعَهْدٍ فَقَالَ : أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدًا حَبِشِيًّا، وَسَتْرُونَ مِنْ بَعْدِي اخْتِلَافًا شَدِيدًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَصُوا عَلَيْهَا بِالتَّوَاجِدِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ."

“ইরবায় বিন সারিয়া থেকে বর্ণিত, একদিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের মাঝে দণ্ডায়মান হলেন অতঃপর অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী নসীহত করলেন, এতে সবার চোখে অশ্রু বয়ে গেল, হৃদয়গুলো ভীত শঙ্কিত হলো। লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল, নিশ্চয়ই এটি বিদায়ী নসীহত, অতএব আপনি আমাদের পালনীয় কিছু নির্দেশনা দিন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন : আমি তোমাদেরকে আল্লাহভীতি অর্জনের ওসিয়ত (অঙ্গিকার, গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ) করছি, নেতার কথা মান্য ও তাঁর আনুগত্যের নির্দেশ দিচ্ছি, যদিও সে হাবশী দাস হয়। আর আমার পর তোমরা প্রচণ্ড মতবিরোধ দেখতে পাবে। সে সময় তোমরা আমার সুন্নাত এবং হেদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাত আকড়ে ধরবে, তোমরা সুন্নাতকে মাড়ির দাঁত দিয়ে আকড়ে ধরো। আর তোমরা সব নব অবিস্কৃত বিষয় থেকে বেঁচে থাকবে, কেননা প্রত্যেক বিদ'আত পথভ্রষ্টতা।”^{৩৬}

এই হাদীস অনেক ফায়েদা বিশিষ্ট। এ হাদীস থেকে অনেক কথা জানা যায়:

এক: রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নসীহত এতই প্রভাবান্বিত ছিল যে এতে মন শঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল এবং চোখে অশ্রু ভেসে যাচ্ছিল।

৩৬. সুনান ইবনু মাজাহ, ইত্তিবাউস সুন্নাতিল খুলাফাইর রাশিদীন, আল্লামা আলবানী সহীহ বলেছেন।

দুই: এটা বিদায়কালের নসীহত এবং মাসনুন ওসিয়ত।

তিন: এটা তাক্বওয়া এবং শরীয়তের প্রাণ।

চার: শাসকের আনুগত্য অপরিহার্য এই শর্তে যে, সে মুমিন হতে হবে এবং শরীয়ত বিরোধী নির্দেশ দিবে না। অর্থাৎ সে এমন কাজের হুকুম দিবে না যাতে সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতা হয়।

পাঁচ: নবী করীম (ﷺ)-এর যুগের পরে বড় ধরনের মতভেদ সৃষ্টি হবে, এবং এমনই হয়েছে। কল্যাণের যুগের (তিন শতাব্দি) পর অনেক নতুন মাযহাব এবং বিভিন্ন পদ্ধতির উৎপত্তি হয়েছে, সবাই যার যার মাযহাবের উপরই সম্ভ্রষ্ট হয়ে গেছে এবং সবাই নিজের একজন ইমাম ও নেতা স্থির করে নিয়েছে, মতানৈক্যের সময় তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং নবী করীম (ﷺ)-এর ওসিয়ত ভুলে গেছে, অথচ নবী করীম (ﷺ)-এর ওসিয়ত ছিল এমন সময় আমার সুন্নাত এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতের উপর চলা।

ছয়: নব উদ্ভাবিত বিষয়াদি (দ্বীনে নতুন নতুন কাজ) থেকে বেঁচে থাক। এর মধ্যে ঐ সমস্ত বিদ'আত এসে গেছে যা তিন যুগের পর বিস্তার লাভ করেছে। এর মধ্যে একটি তাক্বলীদ, কেননা খাইরুল কুর'নে তাক্বলীদের অস্তিত্ব ছিল না।

সাত: নবী করীম (ﷺ) বলেছেন, প্রত্যেক বিদ'আত গোমরাহী। এ থেকে জানা যায় যে, বিদ'আতকে হাসানাহ এবং সাযিয়াহ দ্বারা বিভক্ত করা অনর্থক কাজ।

খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতের সঠিক মর্ম

হানাফী ফিক্বহের উসূলের কিতাব আল-মানারে রয়েছে,

الْمَعْرِفَةُ إِذَا أُعِيدَتْ كَانَتْ الثَّانِيَّةُ عَيْنَ الْأُولَى

মা'রেফাকে (নির্দিষ্ট) যখন মা'রেফা রূপে আবার নিয়ে আসা হয় তখন দ্বিতীয়টির দ্বারা প্রথমটিই উদ্দেশ্যই হয়। কবি বলেন,

إِذَا اشْتَدَّتْ بِكَ الْبَلَوُ فَقَكِّرْ فِي أَلَمْ تَشْرَحْ

فَعَسِّرَ بَيْنَ يَسَرِّينِ إِذَا فَكَرْتَهُ تَفَرُّحُ

“যখন তোমার উপর মুসিবত প্রকট রূপ ধারণ করবে তুমি সূরা আলাম নাশরাহে চিন্তা কর, তুমি দেখবে সেখানে এক কঠিন দুই সহজের মধ্যে রয়েছে, এটা চিন্তা করলে তুমি আনন্দিত হবে।”

﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا - إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ (৭৬-১-৭৫-১-৭৫-১)

“নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে এক সহজ আছে, নিশ্চয়ই সেই কষ্টের সাথে এক সহজ আছে।”^{৩৭}

এখানে **العُسْرِ** শব্দটি মা‘রেফা (নির্দিষ্ট), মা‘রেফা রূপেই তাকে আবার উল্লেখ করা হয়েছে, অতএব দ্বিতীয় **العُسْرِ** শব্দটির দ্বারা হুবহু প্রথমটি উদ্দেশ্য।

এখন উল্লিখিত হাদীসটি লক্ষ্য করুন, সুন্নাত শব্দটি দ্বিতীয়বার মা‘রেফা রূপে এসেছে। এই মূলনীতিকে সামনে রেখেই মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী এর যে অর্থ বর্ণনা করেছেন তা দেখুন,

“وَسُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَعْمَلُوا إِلَّا بِسُنَّتِي فَلَا إِضَافَةَ إِلَيْهِمْ
إِمَّا لَعَمَلِهِمْ بِهَا أَوْ لِاسْتِنْبَاطِهِمْ وَاخْتِيَارِهِمْ إِيَّاهَا”

অর্থ “খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাত এ জন্যই অবলম্বন করতে বলা হয়েছে কেননা তারাও সুন্নাতের উপরই আমল করেছিলেন। তাই সুন্নাতের সম্পৃক্ততা তাদের সাথে হয় এই কারণে করেছেন যে তারা নিজেরা এর উপর আমল করেছেন অথবা তারা সুন্নাতে নববী থেকে কোন কিছু উদঘাটন করে বলেছেন।”^{৩৮}

শাইখ মুহাম্মাদ তাহের হানাফী আরেকটু বৃদ্ধি করে বলেছেন,

“وَلَا تَهْ عِلْمٌ بَعْضُ سُنَّتِهِ لَا يَشْتَهَرُ إِلَّا فِي زَمَانِهِمْ فَأَصَافَ إِلَيْهِمْ رَفْعًا
لِتَوَهُم مِّن رَّدِّ تِلْكَ السُّنَّةِ”

৩৭. সূরা আল-ইনশিরাহ : ৫-৬

৩৮. মিরকাত শারহ মিশকাত- মিসর, ১/১৯৯

অর্থ “কেননা নবী করীম (ﷺ)-এর (আল্লাহ জানিয়ে দেয়ার কারণে) জানা ছিল, তাঁর কিছু সুন্নাত খুলাফায়ে রাশিদীনের সময়ে প্রসিদ্ধ হবে, তাই সুন্নাত শব্দটি তাদের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন ঐ ব্যক্তির সন্দেহ দূর করার জন্য যে এসব সুন্নাতকে প্রত্যাখ্যান করে দিবে।”^{৩৯}

এর সারমর্ম এই যে, খুলাফায়ে রাশিদীন কোন কোন সময় কোন পরিতাজ্য সুন্নাত চালু করেছেন, কোন কোন সময় সুন্নাতে নববী থেকে মাসআলা উদঘাটন করে তাকে আমলে এনেছেন এ ব্যাপারেই বলা হয়েছে খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতের অনুসরণ করা। এই নয় যে, তারা নিজ জ্ঞানের ভিত্তিতে যে ফতোয়া প্রদান করেছেন বা রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যে বিধান জারী করেছেন এতে তাদের তাক্বলীদ করা।

হানাফীদের দেখুন তারা এই হাদীসের বিপরীত শত মাসাইলে খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতের বিপরীত ফতোয়া দিয়েছেন। তাদের নিকট ফজরের নামায ইস্ফার অর্থাৎ ফর্সা হলে। হেদায়ায় রয়েছে:

وَيَسْتَحِبُّ الْإِسْفَارَ بِالْفَجْرِ^{৪০}

হাযেমি কিতাবুল ই‘তিবারে লিখেন,

“الَّتَغْلِيْسُ أَفْضَلُ رَوَيْنَا ذَلِكَ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي مُوسَى وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَعَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ.”

“অন্ধকারে ফজরের নামাযের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা রয়েছে খুলাফায়ে রাশিদীন আবু বাকর, উমার, উসমান, আলী, ইবনে মাসউদ, আবু মুসা, ইবনে যুবাইর, আয়েশা এবং উম্মে সালামা থেকে।”^{৪১}

একটু চিন্তা করুন, এই মাসআলায় তারা ইবনে মাসউদ (রাঃ) এরও পরোয়া করেননি।

৩৯. মাজমাউ‘ল বিহার ১/৩৬৭

৪০. হিদায়াহ, কিতাবুস সলাত পৃষ্ঠা: ৬৬

৪১. কিতাবুল ই‘তিবার লিল হাযিমী, পৃষ্ঠা: ৭২

২.

"عَنْ جَابِرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِنُسْخَةٍ مِنَ التَّوْرَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ نُسْخَةٌ مِنَ التَّوْرَةِ فَسَكَّتْ فَجَعَلَ يَقْرَأُ وَوَجْهَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَغَيَّرُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ثَكِلَتْكَ الثَّوَالِكُ مَا تَرَى مَا يَوْجِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَنَظَرَ عُمَرُ إِلَى وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ ﷺ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ بَدَأَ لَكُمْ مُوسَى فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَذْرَكَ نُبُوتِي لَا تَتَّبَعْنِي))."

“জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, উমার তাওরাতের একটি কপি নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আসেন এবং বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, এটি তাওরাতের একটি কপি, এই বলে পড়তে থাকেন আর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চেহারা বিবর্ণ হতে থাকে, আবু বাকর দেখে বললেন, সন্তান হারা মা তোমায় বিয়োগ করুক, তুমি কি দেখছ না রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চেহারায় কী? উমার (রাঃ) যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চেহারা দেখলেন বললেন, আল্লাহর আশ্রয় কামনা করছি আল্লাহর ক্রোধ এবং তাঁর রাসূল (সঃ)-এর ক্রোধ হতে। আমরা সম্ভ্রষ্ট প্রতিপালক হিসেবে আল্লাহকে নিয়ে, দ্বীন হিসেবে ইসলামকে নিয়ে এবং নবী হিসেবে মুহাম্মাদকে নিয়ে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, কসম ঐ সত্তার যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন, যদি তোমাদের কাছে মুসা প্রকাশ পান আর তোমরা আমাকে ছেড়ে তাঁর অনুসরণ কর তবে তোমরা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে। যদি তিনি জীবিত থাকতেন আর আমার নবুয়ত পেতেন তবে তিনিও আমার অনুসরণ করতেন।”^{৪২}

এই নববী বাণী থেকে পরিস্কার হয়ে উঠে যে, নবী করীম (সঃ)-এর উপস্থিতিতে মুসা আলাইহিস সালামের অনুসারীও পথভ্রষ্ট। তাহলে নবী

৪২. দারিমী, মুকাদ্দামাহ, মা ইত্তাকী মিন তাফসীর হাদীসিন নাবী (সঃ) ও কাওলু গাইরিহী ইনদাহ ক্বাওলিহী (সঃ) হা: ৪৪৯, মুদ্রণ: আনসারুস সুন্নাহ। সনদ দুর্বল, আবার হাসানও বলা হয়েছে।

করীম (রাঃ)-এর হাদীস এবং সুন্নাতে বিদ্যমান থাকতে যে ব্যক্তি ইমামদের তাক্বলীদ ফরয বা ওয়াজিব মনে করে এবং তাদের কথাকে বিধিবদ্ধ আইন বানিয়ে নেয় এবং সেগুলোকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাদীসের উপর অগ্রাধিকার দেয় এমন ব্যক্তির আমল মূল্যহীন এবং তার গোমরাহ হওয়ার বেলায় আর কী সন্দেহ বাকী থাকে।

৩.

"عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَخَطَّ خَطًّا . وَخَطَّ خَطَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَخَطَّ خَطَيْنِ عَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِي الْخَطِّ الْأَوْسَطِ فَقَالَ : هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ : ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾."

"জাবের ইবনু আবদিল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আমরা নবী করীম (সঃ)-এর নিকটে ছিলাম, তিনি একটি রেখা টানলেন, আবার তার ডানদিকে দুটি রেখা টানলেন এবং বামদিকে দুটি রেখা টানলেন, এরপর মাঝের রেখায় হাত রেখে বললেন, এটা আল্লাহর রাস্তা। তারপর এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন,

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (১০৩)

অর্থাৎ আল্লাহ বলেন, নিশ্চয় এটাই আমার রাস্তা যা সঠিক, অতএব তোমরা এই রাস্তার উপরই চলো, অন্যান্য রাস্তার অনুসরণ করো না, করলে তোমরা তাঁর রাস্তা থেকে ছিটকে পড়বে, এটাই তিনি তোমাদেরকে ওসিয়ত করেন, যাতে তোমরা মুত্তাকি হতে পারো।"^{৪৩}

৪৩. ইবনু মাজাহ, ইত্তিবাউস সুন্নাতে রাসূলিল্লাহ (সঃ), হা: ১১। আলবানী এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আবারও কতক মুহাক্কিক একে যঈফও বলেছেন।

এই হাদীস মূলত রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অলৌকিক কথার অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ নবী করীম (ﷺ) আল্লাহর পক্ষ থেকে অবগত হয়ে উম্মতকে সতর্ক করেছেন যে, তাঁর উপর এমন এক ত্রাস্তিকাল আসবে যখন মানুষ কিতাব এবং সুন্নাহের অনুসরণ ছেড়ে দিয়ে কয়েকজন ইমামের তাক্বলীদ করা নিজের উপর অপরিহার্য করে দল বানানোর মধ্যে জড়িয়ে পড়বে। নবী করীম (ﷺ) মাঝের রেখাকে **اللَّهُ سَبِيلُ** (আল্লাহর রাস্তা) বলেছেন। কিছু মানুষ বলে থাকেন, এই দলগুলো ঐ সিরাতে মুস্তাকিম থেকে পৃথক হয়ে আবার সেখানেই এসে মিলিত হয়েছে। প্রশ্ন এই যে, বের হলো কেন? সোজা পথ ছেড়ে পৃথক পৃথক রাস্তায় চলা আবার সামনে গিয়ে সোজা মিলে যাওয়ার শেষ পর্যন্ত কী লাভ?

8.

”عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ : أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِّنْ أَهْلِ الشَّامِ وَهُوَ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ هِيَ حَلَالٌ فَقَالَ الشَّامِيُّ إِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَى عَنْهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ لِي نَهَى عَنْهَا وَصَنَّعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْرًا يَنْتَعِبُ أَمْ أَمْرٌ ﷺ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ بَلْ أَمْرٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَقَدْ صَنَّعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.”

“ইবনে শিহাব হতে বর্ণিত, সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ তাঁকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি শুনেছেন, শামের এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনে উমারকে তামাত্তু হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উমার বলেন এটি বৈধ। শামী লোকটি বলল, আপনার পিতা তো এ থেকে নিষেধ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার বলেন, তুমি কি মনে কর যদি আমার পিতা নিষেধ করে থাকেন আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তা করেন তবে আমার পিতার অনুসরণ করব, নাকি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর? লোকটি বলল, বরং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর। অতঃপর তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এটি (হজ্জ তামাত্তু) করেছেন।”⁸⁸

88. তিরমিযী, পর্ব হাজ্জ, বাব: মা জাআ ফিত তামাত্তু হা: ৮২৪

৫.

"عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ : شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَعُثْمَانَ يَنْهَى عَنِ الْمُتَعَةِ وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ أَهْلَ بَيْتِهِمَا لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ قَالَ مَا كُنْتُ لِأَدْعُ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ أَحَدٍ".

“মারওয়ান ইবনে হাকাম বলেন, আমি উসমান এবং আলী (রাঃ)-কে দেখেছি, উসমান (রাঃ) তামাত্তু* হজ্জ এবং কিরান হজ্জ করতে নিষেধ করেন, আলী (রাঃ) এটা দেখে ‘لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجٍّ’ বলে ইহরাম বাঁধলেন (অর্থাৎ হজ্জে কিরান করলেন) এবং বললেন, আমি কারো কথায় নবীর সুনাত ছাড়তে পারি না।”^{৪৫}

উপরোল্লিখিত দুই হাদীস থেকে জানা গেল, নবী করীম (সঃ)-এর কথা-কর্মের বিপরীত উমার (রাঃ) এবং উসমান (রাঃ)-এর মত মহা মর্যাদাবান সাহাবা (রাঃ) দের কথা যেখানে মানা যায় না সেখানে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কথার বিপরীত ইমামদের মতামত ও গবেষণার কী মূল্য থাকতে পারে।

৬.

"عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : - كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ . فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ أَتَيْتُكَ مِنَ الْمَدِينَةِ مَدِينَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِحَدِيثٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَحَدَّثُ بِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . قَالَ فَمَا جَاءَ بِكَ تِجَارَةً ؟ قَالَ لَا . قَالَ وَلَا جَاءَ بِكَ غَيْرُهُ ؟ قَالَ لَا . قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَظْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ . وَإِنَّ الْعَالِمَ

لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَكُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْحَيَاتَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ. وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَإِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ."

“কাসীর ইবনে কাইস বলেন, আমি দামেশ্কেসের একটি মাসজিদে আবুদ্-দারদা (রাঃ) এর কাছে বসা ছিলাম, ইত্যবসরে একজন লোক তাঁর কাছে এল, এসে বলল, হে আবুদ্-দারদা, আমি আপনার কাছে মদীনা থেকে এসেছি, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর মদীনা থেকে একটি হাদীসের জন্য, শুনেছি আপনি তা রাসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বললেন, কোন ব্যবসা তোমাকে নিয়ে আসেনি? লোকটি বলল, না। তিনি বললেন, এছাড়া অন্য কোন কাজ তোমাকে নিয়ে আসেনি, সে বলল, না। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ইল্ম অনুসন্ধানের জন্য কোন রাস্তা অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন, ফেরেশতারা তালেবে ইলমের (ইলম অর্জনকারীর) সম্ভ্রুতিতে তাদের পাখা বিছিয়ে দেয়, আসমান এবং যমিনে যারা রয়েছে সবাই এমনকি সমুদ্রের মাছ পর্যন্ত তালেবে ইলমের জন্য মাগফিরাত কামনা করে, নিশ্চয়ই আলেমের মর্যাদা আবেদের (ইবাদতকারীর) উপর যেমন চাঁদের মর্যাদা সমস্ত নক্ষত্রের উপর এবং আলেমরা নবীগণের ওয়ারিস, আর নবীরা দিনার দিরহামের ওয়ারিস বানান না, তারা কেবল ইলমের ওয়ারিস বানান, অতএব যে ইলম নিল সে বিরাট একটি অংশ নিল।”^{৪৬}

এই হাদীস থেকে জানা গেল নবীরা ইলমের সম্পত্তি রেখে যান, আর এ কথা স্পষ্ট যে, ইল্ম ঐ জ্ঞানের নাম যা প্রমাণভিত্তিক অর্জন হয় আর তাক্বলীদ অপ্রমাণিত বিষয়ের নাম। অতএব তাক্বলীদের সাথে ইল্মের কোন সম্পর্ক নেই। এ থেকে জানা গেল মুক্বল্লিদরা আলেমদের তালিকা

৪৬. ইবনু মাজাহ, বাব: ফাজলুল উলামা ওয়াল হাস্‌সু আলা ত্বালাবিহ ইলমি, হা:

২২৩। আলবানী সহীহ বলেছেন। আবার কতক মুহাক্কিক একে দুর্বলও বলেছেন।

থেকে বঞ্চিত এবং নবীদের মিরাস থেকে বঞ্চিত, যা দীনার দিরহাম নয় বরং ইল্ম।

৬.

“عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمٌ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ تَسْبِقُ أَيْمَانُهُمْ شَهَادَاتُهُمْ أَوْ شَهَادَاتُهُمْ أَيْمَانُهُمْ.”

“আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ আমার যুগের মানুষ, অতঃপর তারপরের যুগের, অতঃপর তারপরের যুগের। এরপর এমন লোকের আবির্ভাব হবে যারা সাক্ষ্যদানের পূর্বেই কসম করবে আবার কসমের আগেই সাক্ষ্য দিবে।”^{৪৭}

প্রমাণ: এই হাদীসে নবী করীম (সঃ) প্রথম তিন যুগের মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ বলে সংবাদ দিয়েছেন, সেই তিন কালের মানুষের মাযহাব কুরআন এবং হাদীস ছিল। সেই কালে কেউ চোখ বন্ধ করে কোন বুযুর্গ, ইমাম বা আলেমের পিছনে দৌড়াতে না। বরং প্রত্যেকে দূরদর্শিতার সাথে কুরআন এবং হাদীস দেখে দ্বীনের উপর চলতেন। তারা **قَالَ اللَّهُ** এবং **قَالَ الرَّسُولُ** এর উপর জীবন বিলিয়ে দিতেন। এরপর চতুর্থ কালের খারাবী বিশেষ করে মিথ্যা সাক্ষ্যের খবর দিয়ে গেছেন।

অতএব অনুগত মুমিনের জন্য জরুরী হলো দ্বীনের সূত্র সেই তিন যুগ থেকে অনুসন্ধান করবে এবং সেই তিন যুগের পরে মুসলিমদের মাঝে এমন যে সব বিষয়ের উদ্ভব ঘটেছে যার দৃষ্টান্ত সেই তিন যুগে নেই সেগুলোকে অনর্থক মনে করবে। প্রকাশ থাকে যে, খাইরুল কুরুনে তাক্বলীদের অস্থিত্ব ছিল না, অতএব তাক্বলীদ অনর্থকই প্রমাণিত হলো। আর মুমিনের জন্য অনর্থক বিষয় থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য।

৪৭. তিরমিজী, পর্ব: মানাকিব, বাব: মা যাআ ফি ফাজলি মান রাআন নাবী (সঃ), হা: ৩৮৫৯, আলবানী সহীহ বলেছেন।

৭.

"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ."

“আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কোন গোত্রের সাথে সাদৃশ্য রাখে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত।”^{৪৮}

প্রমাণ: খৃষ্টানদের নিজেদের বানানো আকীদা হলো মাজা, মারকুশ, লুকা, ইউহান্না চারটিই ইনজিল, অথচ প্রত্যেকটি কিতাব পৃথক পৃথক তরীক্বার উপর। আজ কিছু মানুষ চার ইমামকেই সত্য জানেন অথচ চারজনের মধ্যে অনেক মতানৈক্য পাওয়া যায়। এমনকি এক বস্ত্র একজনের নিকট হালাল আবার অপরজনের নিকট হারাম।

মু'আয (রাঃ) এর হাদীসের পর্যালোচনা

"عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَخِي الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ نَاسٍ مِنْ أَهْلِ حِمَصٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ مِنْ أَهْلِ حِمَصٍ قَالَ : وَقَالَ مَرَّةً عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ لَهُ : كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ ؟ قَالَ : أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ قَالَ : أَقْضِي بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو، قَالَ : فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ بِيَدِهِ صَدْرِي، قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ."

“নবী করীম (সঃ) যখন মু'আযকে ইয়েমেনে পাঠালেন তখন বললেন, যদি তোমার কাছে কেউ কোন ফায়সালার জন্য আসে তবে তুমি কিভাবে এর মীমাংসা দিবে? তিনি বললেন, আমি আল্লাহর কিতাব দিয়ে সমাধান দিব। নবী করীম (সঃ) বললেন, যদি আল্লাহর কিতাবে এর সমাধান না

৪৮. আবু দাউদ, পর্ব: লিবাস, বাব: মা যাআ ফি লুবসিশ শুহরাতি হা: ৪০৩১

থাকে তবে? তিনি বললেন, তবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাতে দিয়ে। নবী করীম (ﷺ) বললেন, যদি রাসূলুল্লাহর সুন্নাতে এর সমাধান না থাকে তবে? তিনি বললেন, আমি গবেষণা করব এবং এতে কোন ত্রুটি করব না। অতএব নবী করীম (ﷺ) তার বুকে হাত মেরে বললেন, আল্লাহর প্রশংসা যিনি আল্লাহর রাসূলের প্রেরিত দূতকে ঐ জিনিসের তাওফিক দিয়েছেন যাতে আল্লাহর রাসূল সন্তুষ্ট।”^{৪৯}

এই হাদীসটি দুর্বল, এই হাদীসের সনদ সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী বলেন,

"لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ عِنْدِي بِمُتَّصِلٍ."

“আমরা এই হাদীসের অন্য কোন সনদ জানি না, এর সনদ আমার নিকট মুত্তাসিল নয়।”^{৫০}

ইমাম জওয়াক্বানী বলেন,

"هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ، سَأَلْتُ مَنْ لَقِيتُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالتَّقْلِ عَنْهُ، فَلَمْ أَجِدْ لَهُ طَرِيقًا غَيْرَ هَذَا، وَالْحَارِثُ بْنُ عَمْرٍو هَذَا مَجْهُولٌ، وَأَصْحَابُ مُعَاذٍ مِنْ أَهْلِ حَمَصَ لَا يَعْرِفُونَ، وَمِثْلُ هَذَا الْإِسْنَادِ لَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي أَصْلِ مِنْ أَصُولِ الشَّرِيعَةِ."

“এই হাদীসটি বাতিল। আমি হাদীস বর্ণনাকারী যে সমস্ত আলেমদের সাথে সাক্ষাত করেছি এই হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি, কিন্তু হাদীসটির এই সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্র পাইনি। এই সূত্রের বর্ণনাকারী হারিস অপরিচিত এবং মু‘আয থেকে বর্ণনাকারী হিমসবাসীদেরকেও চিনা যায় না। শরীয়তের কোন উসুলের ক্ষেত্রে এই ধরনের সূত্রের উপর নির্ভর করা যায় না।”^{৫১}

৪৯. দারিমী, পর্ব: মুকাদ্দামাহ, বাব: আল-ফুতইয়া ওয়ামা ফীহি মিনাশ্-শিদ্দাহ হা:

১৬৮, সনদ দুর্বল

৫০. তিরমিযী ১-৪১৩

৫১. মিরকাতুস সুউদ হাশিয়াহ আবু দাউদ ১/১৪৯

যদি এই হাদীস সহীহ হয় তবে,

এখনও কি ইয়েমেনে মু'আয ^(রাঃ) এর তাক্বলীদ করা হয়? যদি না হয় তবে সেই পরিত্যক্ত ঘটনা দিয়ে ইমামের তাক্বলীদ কিভাবে প্রমাণিত হয়?

“أَصْحَابِي كَالْجُومِ” হাদীসের পর্যালোচনা

«أَصْحَابِي كَالْجُومِ، فَبِأَيِّهِمْ إِفْتَدَيْتُمْ إِهْتَدَيْتُمْ»

“আমার সাহাবাগণ নক্ষত্রতুল্য, তোমরা তাদের মধ্যে যারই অনুসরণ করবে হেদায়াতের উপর থাকবে।”^{৫২}

আল্লামা আলবানী ‘সিলসিলাতুল আহাদীসিদ্-দ্ব’য়ীফাহ ওয়াল মাউদ্বু’আ’ ১ম খণ্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠায় এই হাদীস উল্লেখ করে বলেন, এ হাদীসটি মাওযু’।

এই হাদীসকে আল্লামা ইবনু আব্দুল বার ‘জামি’উ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাজলিহি’ (২/৮২)তে সালাম বিন সুলাইম এর সূত্রে,

حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ غُصَيْنٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ

মারফু’ হিসেবে বর্ণনা করেন। এই হাদীস সম্পর্কে ইবনু আব্দুল বার বলেন,

“هَذَا إِسْنَادٌ لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ، لِأَنَّ الْحَارِثَ بْنَ غُصَيْنٍ مَجْهُولٌ.”

“এই সনদ দিয়ে দলীল প্রমাণ করা যায় না, কেননা এতে হারিস বিন গুসাইন অপরিচিত।”

ইবনে হাযম বলেন, এই বর্ণনা অকেজো, এতে আবু সুফয়ান দুর্বল, সালাম বিন সুলায়মান মাওযু’ হাদীস বর্ণনা করেন এবং এই বর্ণনাও নিঃসন্দেহে মাওযু’সমূহের মধ্যে একটি।

৫২. জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাজলিহি, বাব: বায়ানু মা ইয়ালযিমুন নাযিরু ফি ইখতিলাফিল উলামা, আশ্-শারীআহ লিল আযরী, নং ১২২৭

সাহাবাদের (রাযিহাতাহু) মতামত এবং তাক্বলীদ

মুহাম্মাদ ইবনে সিরিন (রাযিহাতাহু) বলেন,

"سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: لَا يَزَالُ النَّاسُ عَلَى الطَّرِيقِ مَا اتَّبَعُوا الْأَثَرَ."

“আমি আব্দুল্লাহ ইবনে উমারকে বলতে শুনেছি, মানুষ সর্বদা সঠিক পথে থাকবে যতক্ষণ তারা হাদীসের অনুসরণ করবে।”^{৫৩}

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিহাতাহু) বলেন,

"عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: اتَّبِعُوا وَلَا تَبْتَدِعُوا، وَلَا يُقْلَدَنَّ أَحَدَكُمْ فِي دِينِهِ عَالِمًا."

“অনুসরণ করো এবং বিদ‘আত সৃষ্টি করো না। কেউ দ্বীনের ক্ষেত্রে যেন কোন আলেমের তাক্বলীদ না করে।”^{৫৪}

চার ইমাম এবং অন্যান্য উলামায়ে উম্মতের অবস্থান

আবু হানিফা (রাযিহাতাহু) এর বাণী—

১- "لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِنَا مَا لَمْ يَعْلَمْ مِنْ آيِنَ أَخَذْنَاهُ."

অর্থ “কারো জন্য বৈধ নয় সে আমাদের কথার উপর আমল করবে যতক্ষণ না জেনেছে যে, আমরা এ কথা কোথা থেকে গ্রহণ করেছি।”^{৫৫}

ইমাম সাহেবের এই বাণী থেকে দুটি কথা অত্যন্ত স্পষ্ট। এক: এই যে, মুজতাহিদের জন্য কারো তাক্বলীদ জায়েয নয়, কেননা তিনি যখন মুজতাহিদ তখন তার জন্য দলীল জানা জরুরী, না জানা থাকলে তিনি মুজতাহিদ হবেন না। এভাবে সাধারণের জন্যেও তাক্বলীদ জায়েয নেই, কেননা ইমাম সাহেবের এই কথায় মুজতাহিদ এবং সাধারণের পার্থক্য

৫৩. আল-মাদখাল, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, পৃষ্ঠা ১৯৭

৫৪. তাবারানী কাবীর, এ হাদীসের রাবীগণ সহীহ

৫৫. আল-ইনতিকাহ লি ইবনি আবদিল বার, পৃষ্ঠা ১৩; গায়াতুল আমানী ফির রাদ্দি

আলান নাবহানী ১/৬৯

নেই। দুই: এই যে, দ্বীনের উপর আমল করা ঐ পর্যন্ত জায়েয নয় যতক্ষণ না তার শরয়ী প্রমাণের উপর অবগত হবে।

২- "حَرَامٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْرِفْ دَلِيلَ أَنْ يُفْتِيَ بِكَلَامِي".

“যে ব্যক্তি আমার দলীল সম্পর্কে অবগত নয় তার জন্য আমার কথা দিয়ে ফতোয়া দেয়া হারাম।”^{৫৬}

৩- "فَإِنَّا بَشَرٌ نَقُولُ الْقَوْلَ الْيَوْمَ وَنَرْجِعُ غَدًا".

“আমরা মানুষ, আজ এক কথা বলি কাল সেই কথা থেকে ফিরে যাই।”^{৫৭}

৪- "وَيَحْكَمْ يَعْقُوبُ، لَا تَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ مِنِّي، فَإِنِّي قَدْ أَرَى الرَّأْيَ الْيَوْمَ وَأَتْرُكُهُ غَدًا وَأَرَى الرَّأْيَ غَدًا وَأَتْرُكُهُ بَعْدَ غَدٍ".

“হে ইয়াকুব, তোমার উপর আক্ষেপ! আমার থেকে যা শুনো তার সব লিখো না, কেননা আমি আজ এক মত পোষণ করি আবার কাল তা পরিত্যাগ করি, কালকে আরেক মত পোষণ করলে পরশু তা পরিত্যাগ করি।”^{৫৮}

৫- "إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي".

“যখন সহীহ হাদীস পাওয়া যাবে তখন সেটাই আমার মায়হাব।”^{৫৯}

৬- "إِذَا قُلْتُ قَوْلًا يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ وَخَبَرَ الرَّسُولِ فَاتْرُكُوا قَوْلِي".

“যখন আমি কোন মাসআলা বলব যা আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের হাদীসের বিপরীত হবে তখন তোমরা আমার কথা বর্জন কর।”^{৬০}

৫৬. মীযান কুবরা লিশ্-শা'রানী ১/৫৫

৫৭. সিফাতু সলাতিন নাবী (ﷺ), পৃষ্ঠা ৩৭

৫৮. মীযান কুবরা লিশ্-শা'রানী ১/৬২

৫৯. ইকাজু হুমামি উলিল আবসার, নাসায়েহ খাল্লাফী পৃষ্ঠা ১৫

৬০. মীযান কুবরা লিশ্-শা'রানী ১/৬২

ইমাম মালেক (রহমতুল্লাহি) এর বাণী-

১- "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أٌخْطِئُ وَأُصِيبُ، فَانْظُرُوا فِي رَأْيِي فَكَلَّمَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوا بِهِ، وَكَلَّمَا لَمْ يُوَافِقِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَاتْرُكُوهُ."

“আমি তো কেবল একজন মানুষ, আমি ভুল করি আবার শুদ্ধও করি, অতএব আমার মতামতকে নিরীক্ষা করো, যা কিताব এবং সুন্নাতেের সাথে মিলবে তা গ্রহণ করো, আর যেটাই কিताব ও সুন্নাতেের সাথে মিলবে না তা পরিত্যাগ করো।”^{৬১}

২- "لَيْسَ أَحَدٌ بَعْدَ النَّبِيِّ إِلَّا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ إِلَّا النَّبِيُّ."

“নবী ছাড়া তারপর যে কেউই হোক না কেন তার কথা নেয়া হবে আবার প্রত্যাখ্যানও করা হবে।”^{৬২}

ইমাম শাফেঈ (রহমতুল্লাহি) এর বাণী-

১- "إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي."

“যখন সহীহ হাদীস এসে যাবে তখন সেটাই আমার মাযহাব।”^{৬৩}

২- "إِذَا وَجَدْتُمْ فِي كِتَابِي خِلَافَ سُنَّةِ الرَّسُولِ فَقُولُوا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَدَعُوا مَا قُلْتُ."

“যখন তোমরা আমার কিতাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাতেের বিপরীত পাবে তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাতকে গ্রহণ করবে আর আমার কথা বর্জন করবে।”^{৬৪}

৩- "كُلُّ حَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَهُوَ قَوْلِي وَإِنْ لَمْ تَسْمَعُوهُ مِنِّي."

৬১. জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি- লি ইবনি আবদিল বার ১/৩২, উসূলুল আহকাম লি ইবনি হাযম ২/১৩৯

৬২. জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি- লি ইবনি আবদিল বার ১/৩২, উসূলুল আহকাম লি ইবনি হাযম ২/১৩৯

৬৩. আল-মাজমু‘ লিন-নাওয়াবী ১/৬৩

৬৪. মানাকিবুশ্-শাফিযী লিল বায়হাকী ১/৩৭২

“নবী করীম (ﷺ) থেকে বর্ণিত সব হাদীসই আমার মত যদিও তোমরা তা আমার কাছ থেকে না শুন।”^{৬৫}

৬- "كُلُّ مُتَكَلِّمٍ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَهُوَ الْحَقُّ وَمَا سِوَاهُ هَذَا".

“কিতাব এবং সুন্নাহ থেকে প্রত্যেক বক্তব্য দানকারী সত্য, এছাড়া যা রয়েছে সব প্রলাপ।”^{৬৬}

ইমাম আহমাদ (রহমতুল্লাহি আলাইহ) -এর বাণী-

১- " لَا تُقَلِّدُونِي وَلَا مَالِكًا وَلَا الشَّافِعِيَّ وَلَا الْأَوْزَاعِيَّ وَلَا الثَّوْرِيَّ، وَخُذُوا مِنْ حَيْثُ أَخَذُوا".

“তোমরা আমার তাক্বলীদ করো না, না মালেকের, না শাফিঈর, না আওয়াঈর, না সাওরির। তোমরা সেখান থেকে নাও যেখান থেকে তারা নিয়েছেন।”^{৬৭}

২- "مَنْ رَدَّ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَهُوَ عَلَى شَفَا هَلَكَةٍ".

“যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করল সে ধ্বংসের দার প্রাপ্তে।”^{৬৮}

আল্লামা আবেদ সিদ্দী (রহমতুল্লাহি আলাইহ) বলেন,

আল্লামা আবেদ সিদ্দী (রহমতুল্লাহি আলাইহ) দূররে মুখতারের টিকা ‘তাওয়ালি’উল আনওয়ায়ে’ শাইখ আবুল-মা’আলী থেকে বর্ণনা করেন,

"وَجُوبُ تَقْلِيدِ مُجْتَهِدٍ مُعَيَّنٍ لَا حُجَّةَ عَلَيْهِ لَا مِنْ جِهَةِ الشَّرِيعَةِ وَلَا مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ".

“নির্দিষ্ট মুজতাহিদের ব্যক্তি সত্তার তাক্বলীদ ওয়াজিব হওয়ার উপর শরীয়তের কোন দলীল নেই, না শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে, না জ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে।”^{৬৯}

৬৫. মানাকিবুশ্-শাফিঈ লি ইবনি আবী হাতিম, পৃষ্ঠা ৯৩

৬৬. তাওয়ালি আত্-তা’সীস লি ইবনি হাজার পৃষ্ঠা ১১০

৬৭. ই’লামুল মুওয়াক্কিযীন ২/৩০২

৬৮. সিফাতু সলাতিন নাবী (ﷺ)- আলবানী, পৃষ্ঠা ৫৩

মুক্বাল্লিদ এবং জ্ঞান

আব্দুল্লাহ ইবনে মু'তামির বলেন,

"لَا فَرْقَ بَيْنَ بَهِيمَةٍ تَنْقَادُ وَإِنْسَانٍ يُقَلَّدُ."

“অনুগত প্রাণী এবং মুক্বাল্লিদ মানুষের মাঝে কোন পার্থক্য নেই।”^{৭০}

তাক্বলীদ এক বিপদ

"هَذَا كُلُّهُنَّ مِنْ آفَةِ التَّقْلِيدِ وَعَدَمِ رُجُوعِهِمْ إِلَى مَذَارِكِ الْحَدِيثِ."

“এসবগুলো তাক্বলীদের বিপদ এবং হাদীসের কিতাবসমূহের দিকে মানুষের প্রত্যাবর্তন না করার ফল।”^{৭১}

শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিস দেহলভী (রহমাতুল্লাহু আলাইহ) বলেন,

"عَلَّمَ رَأْيَهُ يَتَّبِعُ مِمَّنْ رَأَى زَيْدَ شَوْذٍ بَلْكَ يَخْذَلُ."

“মুক্বাল্লিদরা আলেমদেরকে নবীর মর্যাদায় পৌঁছিয়ে দিয়েছে এমনকি আল্লাহর মর্যাদায় পৌঁছিয়ে দিয়েছে।”^{৭২}

তিনি আরো বলেন,

"مِنَ اللَّطَائِفِ الَّتِي قَلَّمَا ظَفَرَ بِهَا جَدِّي كَحِفْظِ مَذْهَبِهِ مَا اخْتَرَعَهُ الْمُتَأَخَّرُونَ لِحِفْظِ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَهِيَ عِدَّةٌ قَوَاعِدُ يَرُدُّونَ مَا جَمِيعَ مَا يَخْتَجُّ بِهَا عَلَيْهِمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ."

“দুনিয়ার সবচেয়ে বিরল বস্তু যা আমি মেনে নিতে পারিনি যেমন, আবু হানিফার মাযহাবের হেফাজতের জন্য পরবর্তীদের কতিপয় বানানো রীতি যা দ্বারা তারা তাদের মাযহাবের বিরোধ সব সহীহ হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করে দেন।”^{৭৩}

৬৯. আল-ইরশাদ, আনসারী, পৃষ্ঠা ৬৩

৭০. ই'লামুল মুওয়াফ্ফিয়ীন, শারার আল-মাতালিআহ মুদ্রিত ১/১২৭

৭১. আল-ইরশাদ, আনসারী পৃ: ১৬৬।

৭২. ফাতাওয়া আযীযিয়া ১/১৭৬

৭৩. ফাতাওয়া আযীযিয়া, পৃষ্ঠা ৬২

আহনাফের ইমাম কারখির এ ব্যাপারে এই মূলনীতি লক্ষ্য করুন,
 "إِنَّ كُلَّ آيَةٍ تُخَالِفُ قَوْلَ أَصْحَابِنَا فَإِنَّهَا تُحْمَلُ عَلَى النَّسْخِ أَوْ عَلَى
 التَّرْجِيحِ، وَالْأَوَّلَى أَنْ تُحْمَلَ عَلَى التَّائِيلِ مِنَ جِهَةِ التَّوْفِيقِ".

“প্রত্যেক আয়াত যা আমাদের ইমামদের কথার বিপরীত সেগুলোর ব্যাপারে এই বুঝতে হবে যে, আয়াতটি রহিত, অথবা অন্য কোন দলীলকে তার উপর প্রাধান্য দিবে, তবে উত্তম হলো এমন ব্যাখ্যা করা যাতে আয়াত এবং আমাদের ইমামদের কথার মাঝে সামঞ্জস্য হয়ে যায়।”^{৭৪}

ইমাম কারখী (رحمہ اللہ) এর আরেকটি উসূল দেখুন,

ہر وہ حدیث ہمارے اصحاب کے قول کے خلاف ہو اسے نسخ پر محمول کیا جائے گا یا یہ سمجھا جائے گا کہ وہ اپنی ہم پلہ حدیث کے معارض ہے۔ پھر کوئی اور ایسی دلیل یا ان وجوہ ترجیح میں سے وجہ ترجیح لائی جائے گی جن کے ساتھ ہمارے اصحاب (فقہاء احناف) حجت قائم کرتے ہیں، یا اسے تطبیق پر محمول کیا جائے گا اور دلیل قائم ہونے کی مناسبت ہی سے ایسا کیا جائے گا۔ لہذا اگر نسخ کی دلیل قائم ہو جائے تو اسے نسخ پر محمول کیا جائے گا اور اگر دلیل کسی اور پر قائم ہو جائے تو ہم اس کی طرف رجوع کریں گے۔

অর্থ “যে হাদীসই আমাদের ইমামদের কথার বিপরীত হবে তাকে রহিত বলে ধরে নিতে হবে, অথবা এই বুঝে নিতে হবে যে এটা তার মত আরেক হাদীসের বিরোধ, এরপর এমন কোন দলীল বা অগ্রাধিকারের কারণ উল্লেখ করবে যাতে আমাদের আসহাব (ফুক্বাহায়ে আহনাফ) এর দলীল প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। অথবা তাতে সামঞ্জস্যতা বিধান প্রদান করবে এবং দলীল প্রতিষ্ঠিত করার কারণেই এমনটি করবে। অতএব যদি রহিত হওয়ার উপর দলীল প্রমাণিত হয় তবে রহিতই মনে করবে, আর যদি অন্য কোন দলীল প্রতিষ্ঠিত হয় তবে আমরা সেদিকে প্রত্যাবর্তন করব।”^{৭৫}

৭৪. উসূলুল কারখী উসূলে ফিক্বহে হানাফী, (অনুবাদ: ড. হাফেজ শাহবাজ হাসান),
 ক্বায়েদা ২৮, মুদ্রণ মাকতাবা আফকারে ইসলামী, লাহোর

৭৫. প্রাণ্ডক্ত: উসূল নং: ২৯

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রাহমতুল্লাহি আলাইহ) বলেন,

"وَحُفَيَّاانِ بَرَأَى اَحْكَامَ مَذْهَبِ خُودِ اصْلَ چَند تراشیده:

الْخَاصُّ بَيْنَ فَلَا يَلْحَقُهُ الْبَيَانُ، الْعَامُّ قَطْعِي كَالْخَاصِّ، الْمَفْهُومُ الْمُخَالِفُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ، التَّرْجِيحُ بِكَثْرَةِ الرُّوَاةِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ، الزِّيَادَةُ عَلَى الْكِتَابِ نَسْخٌ

“হানাফীরা নিজের মাযহাবকে শক্ত করার জন্য কিছু উসূল বানিয়ে নিয়েছে যেমন: খাস এটি স্পষ্ট, একে স্পষ্ট করার প্রয়োজন নেই, ‘আমও খাসের মত অকাট্য, বিপরীত অর্থ গ্রহণযোগ্য নয়, বর্ণনাকারী বেশি হওয়ার কারণে অগ্রাধিকার দেওয়া ধর্তব্য নয়, কিতাবুল্লাহর উপর বৃদ্ধি করা কিতাবকে রহিত করা।”^{৭৬}

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রাহমতুল্লাহি আলাইহ) বলেন,

التَّقْلِيدُ حَرَامٌ وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ قَوْلَ أَحَدٍ غَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ بِلَا بُرْهَانٍ.

“তাক্বলীদ হারাম, কারো জন্য বৈধ নয় সে রাসূলুল্লাহ (সাঃ আলাইহিস সালাম) ছাড়া অন্য কারো কথা দলীল ছাড়া গ্রহণ করবে।”^{৭৭}

আল্লামা যামাখশারী এই উপমা লিখেছেন,

"إِنْ كَانَ لِلضَّلَالِ أُمَّ فَالتَّقْلِيدُ أُمُّهُ فَلَا جَرَمَ أَنَّ الْجَاهِلَ يُقَلِّدُهُ."

“যদি গোমরাহীর মা থাকে তবে তাক্বলীদ তার মা, অতএব নিশ্চিত জাহেলই তাক্বলীদ করে।”^{৭৮}

আল্লামা ইবনে হাযম বলেন,

"وَاهْرَبْ عَنِ التَّقْلِيدِ فَهُوَ ضَلَالَةٌ، إِنَّ الْمُقَلَّدَ فِي سَبِيلِ الْهَالِكِ."

“তাক্বলীদ থেকে পলায়ন করো কেননা তা ভ্রষ্টতা, নিশ্চয়ই মুক্বাল্লিদ ধ্বংসের পথে রয়েছে।”^{৭৯}

৭৬. কুররাতুল আইনাইন, পৃষ্ঠা ১৮৬

৭৭. ই-কদুল জীদ: পৃষ্ঠা ৩৯, সিদ্দীকি প্রেস লাহোর মুদ্রিত

৭৮. আত্-ওয়াকুয যাহাব, পৃষ্ঠা ৪৭, মিশর মুদ্রিত

মোল্লা মুঈন হানাফী বলেন,

وَمَنْ يَفْتَضِلْ بِوَاحِدٍ مُّعَيَّنٍ غَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ وَيَرَى أَنَّ قَوْلَهُ هُوَ الصَّوَابُ
الَّذِي يَجِبُ اتِّبَاعُهُ ذُوْنَ الْأَيْمَةِ الْآخَرِينَ فَهُوَ ضَالٌّ جَاهِلٌ بَلْ قَدْ يَكُونُ
كَافِرًا يُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ، فَإِنَّهُ مَتَى اعْتَقَدَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ
اتِّبَاعُ وَاحِدٍ بَعِيْنِهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيْمَةِ ذُوْنَ الْآخَرِينَ فَقَدْ جَعَلَهُ بِمَنْزِلَةِ النَّبِيِّ
ﷺ وَذَلِكَ كُفْرٌ.

“যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ব্যতীত কোন নির্দিষ্ট একজনের মাযহাবের উপর জমে থাকে এবং মনে করে যে, তার কথাই সঠিক তার অনুসরণ জরুরী অন্য ইমামদের কথা নয়, তবে সে ভ্রষ্ট মুর্থ বরং অনেক ক্ষেত্রে সে কাফের হয়ে যাবে তাকে তওবা করাতে হবে। তওবা করলে ভাল নচেৎ তাকে হত্যা করা হবে। কেননা সে যখন বিশ্বাস করল মানুষের উপর এসব ইমামদের মধ্যে নির্ধারিত একজনের অনুসরণ জরুরী অন্যদের নয় তখন সে তাকে নবীর মর্যাদায় উপনীত করল আর এটা কুফরী।”^{৮০}

জালালুদ্দীন রুমী বলেন,

"پسِ خُطِرْ بِأَشَدِّ مَقْلَدٍ رَا عَظِيمٍ

أَرْزُهُ وَرَهْرَهْرُنْ زَشِيْطَانِ رَجِيْمٍ".

“ইবলিশ শয়তানের পক্ষ থেকে মুকদ্দিসদের জন্য বড় বিপদ রয়েছে।”^{৮১}

সা‘দী শিরায়ী বলেন,

"خِلَافِ مَنِّيْكُمْ كَيْسِيْ رَهْ كَزِيْدٍ

كِهْ هَرْدَكْزِيْ بِمَنْزِلِ نَبِيٍّ فَوَاحِدٌ رَّسِيْدٍ".

৭৯. মি‘য়ারুল হাক্ক, রহমানী মুদ্রিত, পৃষ্ঠা ২৫২

৮০. দিরাসাতুল লাবীব: পৃষ্ঠা ১২৫, লাহোর মুদ্রিত

৮১. মাসনাবী মাওলানা রুমী, নাওল কিশ্‌ওয়ার মুদ্রিত, পৃষ্ঠা ৪৪৯

ہو بلکہ مجتہد کی دلیل اس مسئلہ میں بجز قیاس کچھ نہ ہو بلکہ خود اپنے دل میں بھی اس تاویل کی وقعت نہ ہو، مگر نصرت مذہب کے لیے تاویل ضروری سمجھتے ہیں یہ دل نہیں مانتا کے قول مجتہد اپنے مذہب) کو چھوڑ کر حدیث صریح پر عمل کر لیں۔

“مؤکالہد ساধারণ بآکتیبرگ امنکی بشوہمرواؤ ائی ٲریماف جماتبکک ہئ ے، یءی مؤجتاہیدہر کٹا اٹھاٲ نیجہر ماہاہاہر ایمامہر ٲرٲریت کوان آرات اٹہاا ہادیس کانہ آاسہ اٹن اادہر مانہ ٲراسارات ٲفولناتا ٹاکہ نا، مان آشاٹت ہئہ ےاا، امنکی ٲٹامہ اٹنرہ اٹہیکار سٹٹ ہئ، اارٲر باآٹاار ٲٹنہ ٲڈہ ےاا ٹاٹ اٹتہئ دٲربٹٹ ہاک، ٹاٹ کٹٹ شکت دلتل اہر ٲرٲریت ٹاکوک، برٹ مؤجتاہیدہر دلتل ائی ماسآالائ کیاس ٹاڈا کیٹٹ نا ٹاک، امن کی نیجہر مانہؤ سہئ باآٹاار اٲر آاٹٹا ٹاکہ نا کٹٹ ماہاہاہر سہٹاااٹار انآ باآٹاکہ جررٹ مانہ کرہ، مان اٹا مانہ نا ے، مؤجتاہیدہر ماتامٹ (نیجہر ماہاہاہ) ٹہڈہ سٲٹٹ ہادیسہر اٲر آمال کرہ نیرہ۔”

ماولانا آاشراف آالی ٹانٹٹ (ہماٹٹٹ آالائٹ) اہر ٲہرہشانی

مولانا اٹرف علی ٹٹانوی مقلدین سہ رنجیدہ ہو کر خون کہ آنسویوں بہاتہ ہیں:
 ”مقلدین نے اپنے ائمہ کو معصوم عن الخطاومصیب وجوباً اور مفروض الاطاعت تصور کر کہ عزم بالجرم کیا کہ خواہ کیسی ہی حدیث صٹٹ، مٹالف قول امام ہو اور مستند قول امام کا بجز قیاس کہ امر دیگر نہ ہو ٲھر بھی بہت سی علل اور خلل حدیث میں ٲیدا کر کہ یا اس کی تاویل بعید کر کہ حدیث کو رد کریں گہ اور قول امام کو نہ چھوڑیں گہ“ (فتاویٰ امدادیہ، ص ۹۵)

মাওলানা আশরাফ আলী খানভী ^(যেযাহাদেই আলহীহ) মুক্বাল্লিদগণের উপর পেরেশান হয়ে রক্তের অশ্রু প্রবাহিত করতেন এই বলে,

“মুক্বাল্লিদরা নিজেদের ইমামকে ভুলের উর্ধ্বে এবং অপরিহার্যভাবে অভ্রান্ত ও তাদের অনুসরণ ফরয কল্পনা করে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে নিয়েছে যে, চাই হাদীস যতই সহীহ হোক না কেন যদি তা ইমামের কথার বিপরীত হয় এবং ইমামের কথা ক্বিয়াস ব্যতীত অন্য কিছু না হয় তবুও হাদীসের মাঝে অনেক কারণ ও সমস্যা সৃষ্টি করে এর দূরবর্তী ব্যাখ্যা করে হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করে দেবে কিন্তু ইমামের কথা ছাড়বে না।”^{৮৬}

শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেব বলেন,

“সাহাবীর কথা যদি হাদীসের সাথে বিরোধপূর্ণ হয় এবং ব্যাখ্যার কোন সুযোগ থাকে তবে তা ছেড়ে দেয়া এবং রাসূলুল্লাহ এর কর্মকে নিজের মাযহাব স্থির করা উচিত”^{৮৭}

ইবলিসের ধোঁকা

আব্দুর রহমান জাওয়ী তাঁর কিতাব ‘তালবিসে ইবলিসে’ লিখেন, শয়তান দুভাবে এই উম্মতে আক্বীদায় প্রবেশ করে। (১) বাপ দাদার তাক্বলীদের রাস্তা দিয়ে। (২) এমন কথাবার্তায় ডুবিয়ে যেগুলোর কোন তলা পাওয়া যায় না অথবা চিন্তাকারী সেই তলায় পৌঁছতে পারে না। অতএব ইবলিস দ্বিতীয় প্রকার লোকদেরকে বিভিন্ন ধরনের গৌজামিলে ঢুকিয়ে দিয়েছে।

আর প্রথম প্রকারের বেলায় ইবলিস একথা ছড়িয়ে দিয়েছে যে, দলীল অনেক সময় সন্দেহপূর্ণ হয় এবং সঠিক কথা উহ্য থাকে, তাই তাক্বলীদ করে যাওয়াই নিরাপদ রাস্তা। এভাবে তাক্বলীদের পথ ধরেই অনেক মাখলুক পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং সাধারণত এই কারণেই মানুষের ধ্বংস এসেছে। নিশ্চয় ইয়াহুদী, খৃষ্টানরা তাদের বাপ দাদা, পাদ্রি এবং পোপদের

৮৬. ফাতওয়া ইমদাদিয়া, পৃ: ৯৫

৮৭. আহসানু কুরা: ১৪৭

তাক্বলীদ করেছে এবং ইসলামের পূর্বে জাহিলিয়াতের যুগে মানুষ এই তাক্বলীদের উপর জমে ছিল।

আর একথা স্পষ্ট থাকা চাই যে, যে দলীল দিয়ে তারা তাক্বলীদের প্রশংসা করেছে সেই দলীলেই তাক্বলীদের খারাবী বের হয়ে আসে। কেননা দলীল যখন সন্দেহজনক হয় এবং সঠিক রাস্তা উহ্য হয় তখন তাক্বলীদ ছেড়ে দেয়া উচিত ছিল যাতে গোমরাহীতে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে।

দ্বিতীয় প্রকার তাক্বলীদকারীরা জ্ঞানের উপকার নষ্ট করে দেয়, কেননা জ্ঞান সৃষ্টি করা হয়েছিল যেন মানুষ চিন্তা ভাবনা করে। যে ব্যক্তিকে আল্লাহ এই বাতি দিয়েছেন যদি সে বাতি নিভিয়ে অন্ধকারে চলে তবে তার এই চলাটা বোকামী। যতজন মাযহাব লালনকারী রয়েছেন তাদের মাথায় এক ব্যক্তির বড় মর্যাদা কল্পিত হয়ে গেছে, এখন যা কিছু তিনি বলেন তাকে না জেনে না বুঝে মানে এবং অনুসরণ করে। এটাই মূল গোমরাহী।

হারেস ইবনে হাওত্ব ^(রাহিমাহুল্লাহ) আলী ^(রাহিমাহুল্লাহ) কে জিজ্ঞাসা করলেন, তালহা ^(রাহিমাহুল্লাহ) এবং যুবাইর ^(রাহিমাহুল্লাহ) বাতিলের উপর ছিলেন? আলী ^(রাহিমাহুল্লাহ) বললেন, হে হারেস, তোমার কাছে বিষয়টি সন্দিহান, সত্য চিনা মানুষের কাছ থেকে হয় না বরং সত্য নিজে চিনে নাও তবে সত্যবাদী কারা তাদেরকেও চিনে নিবে।”^{৮৮}

তাক্বলীদ এবং যুক্তি দর্শন

মুকাব্বিদগণের কথা হলো, ‘দ্বীন একটাই তবে তার চারটা কোণা রয়েছে’ একথা সরাসরি ভুল ধারণা। এই আপত্তি দ্বীন এবং মাযহাব না বুঝা থেকে সৃষ্টি হয়েছে। ইসলাম একটি জিন্স (জাত), তার অধিনে কয়েক আনওয়া (প্রকার) রয়েছে, হানাফি, মালেকি, শাফিঈ এবং হাম্বলি। যেমন হাইওয়ান (প্রাণী) একটি জিন্স তার অধিনে কয়েক আনওয়া রয়েছে, যথা: মানুষ, গরু, ছাগল, গাধা ইত্যাদি।

৮৮. আব্দুর রাহমান জাওয়াযী মৃত: ১৩২৩ হিজরী, তালবিসে ইবলিস উর্দু অনুবাদ সহ,
পৃ: ১১২-১১৩, ফারুকী প্রেস, দিল্লি

এর উত্তর হলো, জিন্স মূলতঃ জিন্স হিসেবে নির্ধারিত কোন সত্তা নয় যতক্ষণ পর্যন্ত তার সাথে ‘فصل مقدم’ (প্রধান ফাছল বা সত্তা নিরূপণকারী) না থাকে। আপনার কি জানা নেই যে, প্রাণীকে প্রাণী হিসেবে কোথায়ও পাওয়া যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার সাথে ফুছলে মুক্বাব্বিমাহ বা আলাদা উপাদান না আসবে। ইসলাম যদি জিন্স হয় তবে হানাফিয়াত, শাফিঈয়াত ইত্যাদির পূর্বে তার অস্তিত্ব ছিল কি না? যদি থাকে এবং নিশ্চিত ছিল তাহলে ইসলাম জিন্স নয়, আর যদি না থাকে তবে ইসলামের সূচনা চার ইমাম থেকে হয়েছে।

الْمَقُولُ عَلَى كَثِيرَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ بِالْحَقَائِقِ

অর্থাৎ জিন্স ঐ কুল্লি (পূর্ণাঙ্গ সত্তা) যা এমন অনেক সংখ্যার উপর প্রয়োগ যেগুলোর প্রকৃতি ভিন্ন। যেমন: প্রাণী। নাওউন এর সংজ্ঞা:

الْمَقُولُ عَلَى كَثِيرَيْنِ مُتَّفِقَيْنِ بِالْحَقَائِقِ

অর্থাৎ ঐ কুল্লি (সামষ্টিক) যা এমন অনেক সংখ্যার উপর প্রয়োগ যেগুলোর প্রকৃতি অভিন্ন, যেমন: মানুষ। অতএব জিন্স এবং নাওউন উভয় এক কিভাবে হয় যখন উভয়ের সংজ্ঞা ভিন্নতর। মানতেকবিদদের বস্তিতে যে সেবক হিসেবে থাকে সেও জানে যে, যে ‘فصل’ টি ‘نوع’ এর ‘مقوم’ (নির্ধারক) হয় তা জিন্সের জন্য ‘مقسم’ (বণ্টনকারী) হয়ে থাকে। যেমন: ‘حَيَوَانٌ’ জিন্সের সাথে ফছল ‘نَاطِقٌ’ মিলিত হয়ে প্রকার নিরূপণের কারণে তা মুক্বাব্বিম হবে এবং জিন্সের জন্য বণ্টনকারী বলা হবে, যার ফলে জিন্স বিভিন্ন আকৃতিতে বণ্টন হয়ে যাবে।

মানতেকের ছাত্ররা জানে যে, জিন্সের সাথে ফছলে মুক্বাব্বিম না আসা পর্যন্ত তা "لا شيء" এর মূল্য রাখে না। ('কিছু নেই' এর মাঝে যে অস্তিত্ব রয়েছে সেটুকুও নেই)

তাহলে হানাফি মাযহাবকে হানাফিয়াতের পূর্বে মুসলমান বলা যেমন ফছলে মুক্বাব্বিম ছাড়া জিন্স প্রতিষ্ঠিত মানা যা মানতেকবিদদের নিয়মের উল্টো।

ক্বিয়াস এবং ফিক্বহ শাস্ত্রের রাস্তা

"كَانَتْ عَائِشَةُ يُؤَمُّهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانٌ مِنَ الْمُصْحَفِ."

“আয়েশা رضي الله عنها-এর গোলাম যাকওয়ান কুরআন থেকে দেখে দেখে পড়ে আয়েশার ইমামতি করতেন”।^{৮৯}

কিন্তু ফিক্বাহর বক্তব্য হলো,

"لَوْ نَظَرَ الْمُصَلِّي إِلَى الْمُصْحَفِ وَقَرَأَ مِنْهُ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ لَا إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ بِشَهْوَةٍ."

“যদি সলাত আদায়কারী সলাতে কুরআন থেকে দেখে পড়ে তবে তার সলাত নষ্ট হয়ে যাবে, কিন্তু যদি কোন মহিলার লজ্জাস্থানের দিকে উত্তেজনাবশতঃ তাকায় তবে সলাত নষ্ট হবে না”।^{৯০}

এখন এই যুক্তির লালন এবং এই ফিক্বহ শাস্ত্রের প্রতিপালন কে বুঝবে, যেখানে কুরআন দেখে পড়লে মনোযোগ নষ্ট হয় এবং অতিরিক্ত কাজ হয়, আর লজ্জাস্থানের দিকে যৌন আবেগ নিয়ে তাকালেও সলাতের মনোযোগে কোন প্রভাব পড়ে না!

"يَوْمُ الْقَوْمِ أَقْرُوهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمَهُمْ بِالسَّنَةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السَّنَةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمَهُمْ هِجْرَةَ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَكْبَرَهُمْ سِنًا، وَلَا يَوْمُ الرَّجُلِ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَجْلِسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ."

“আবু মাসউদ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মানুষের ইমামতি সেই ব্যক্তি করবে যে আল্লাহর কিতাবের সবচেয়ে বেশি ক্বারী, যদি সবাই পড়ায় সমান হয় তবে ইমামতি করবে যে হিজরতে অগ্রগামী। যদি সবাই হিজরতে সমান হয় তবে ইমামতি করবে যে হাদীসের বেশি জ্ঞানী। যদি হাদীসের জ্ঞানে সবাই সমান হয় তবে

৮৯. বুখারী, পর্ব: **আজাল**, বাব: ইমামাতুল আবদি ওয়াল মাওলা তা'লীকান

৯০. আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, হিন্দ ছাপা, পৃষ্ঠা ৪৩৪

ইমামতি করবে যার বয়স বেশি। কেউ অন্যের স্থানে গিয়ে ইমামতি করবে না এবং অন্যের আসনে গিয়ে বসবে না, তবে সে অনুমতি দিলে বসতে পারে।”^{৯১}

পাঠক, উল্লিখিত হাদীসটি দেখুন, এখানে ইমামতি করার শর্ত বলে দেয়া হয়েছে। ইমামের শারিরীক ক্রটি (অন্ধত্ব, ল্যাংড়া হওয়া) থেকে মুক্ত হওয়া ইমামতির শর্ত হত তবে নবী করীম (ﷺ) তারও উল্লেখ করে দিতেন। বরং ব্যাপারটি সম্পূর্ণ বিপরীত। অন্ধের ইমামতির আলোচনা কয়েক হাদীসে রয়েছে।

আনাস (রাঃ) বলেন,

"إِسْتَخْلَفَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ مَرَّتَيْنِ يُصَلِّي بِهِمْ وَهُوَ أَعْمَى."

“আল্লাহর রাসূল (ﷺ) মদীনায় (তাঁর অনুপস্থিতিতে) দুইবার আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুমকে ইমামতির দায়িত্ব দেন, অথচ তিনি অন্ধ।”^{৯২}

"أَنَّ عُثْبَانَ بْنَ مَالِكٍ يَوْمُ الْقَوْمِ وَهُوَ أَعْمَى."

“উত্বান ইবনে মালেক স্বগোত্রের ইমামতি করতেন, তিনি অন্ধ ছিলেন”।^{৯৩}

বিস্ময়কর বিষয় যে, এসব হাদীস থাকাবস্থায় কিছু মানুষের কথা হলো শারিরীক দোষক্রটি রয়েছে এমন মানুষের ইমামতি সঠিক নয়।

মারাক্বিল ফালাহ কিতাবের হানাফী লেখক বলেন,

"مَاءُ الْبَيْتْرِ التَّجَسُّسِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ حَيَوَانٌ ثُمَّ مَاتُوا نَتَفَخُ... فَإِنْ عُجِنَ الْآنَ بِمَائِهَا قِيلَ يُلْقَى لِلْكِلَابِ أَوْ يُعْلَفُ بِهِ الْمَوَاشِي وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَبَاعُ لِشَافِعِي"

“কুপের পানিতে কোন জানোয়ার পড়ে মারা গেলে, ফুলে গেলে নাপাক..., এখন যদি এই নাপাক পানি দিয়ে আটার খামির করে নেয় (পরে জানা গেল পানি নাপাক ছিল) তবে তা কুকুরের জন্য ফেলে দিবে অথবা

৯১. নাসায়ী, পর্ব ইমামতি, বাব কে ইমামতি করার অধিক উপযুক্ত হা: ৭৮১

৯২. মুসনাদ আহমাদ হা: ১৩০৩১, বায়তুল আফকার, রিয়াদ মুদ্রিত

৯৩. নাসায়ী, পর্ব: ইমামতি, বাব: অন্ধের ইমামতি, হা: ৭৮৯

ইমাম ত্বাহাবী এজন্যই বলেন, “ لَا يُقَلَّدُ إِلَّا عَصِيٍّ أَوْ غَيٍّ ”
তাকুলীদ কেবল গোঁড়া এবং বোকাই করে।

ইজতিহাদ এবং তাক্বলীদ

প্রশ্ন এই যে, আয়িম্মায়ে কেরামদের পূর্বে উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ সাহাবায়ে কেরামগণ (রাহিমুল্লাহ রাহিমুহুম) কোন ব্যক্তির তাক্বলীদ করতেন? উত্তর এই যে, তারা কারো তাক্বলীদ করতেন না। একমাত্র কিতাব ও সুন্নাতের উপর তাদের আমল ছিল। এরপর ইমামদের যুগ আসল, তাদের সময়ে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীসসমূহ এভাবে একত্রিত হয়নি। তাই অনেক আগত মাসাইল যেগুলো সম্পর্কে তাদের কাছে হাদীস পৌঁছেনি সেগুলোর ব্যাপারে তারা গবেষণার মাধ্যমে ফতোয়া দিয়েছেন এবং পরে যখন দেখা গেছে গবেষণাটি হাদীসের বিপরীত ছিল তখন তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

ইজতিহাদকে আপনি একটি উপমার মাধ্যমে বুঝুন, রাতে আপনি কোথায়ও অবতরণ করলেন, আপনাকে ইশার সলাত পড়তে হবে, কিন্তু আপনি জানেন না কিবলাহ কোনদিকে? আপনি চিন্তা (ইজতিহাদ) করলেন এবং আপনার চিন্তা অনুযায়ী কিবলাহ মনে করে একদিকে সলাত আদায় করে নিলেন। ফজরের সলাতও আপনি সেদিকে মুখ করেই পড়লেন। সূর্য উদয় হওয়ার পর আপনি জানলেন যে, আপনি কিবলাহ মুখী না হয়ে অন্যদিকে মুখ করে সলাত পড়েছেন, এখন আপনাকে যোহরের সলাত কোনদিকে পড়তে হবে?

ইশা এবং ফজর যা আপনি ভুল দিকে আদায় করেছিলেন তা সঠিক হয়ে গেছে। সেই দুই সলাত পুনরায় পড়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এখন সূর্য উঠার পর আপনার কাছে পরিস্কার হয়ে গেছে যে, আপনি ভুল দিকে সলাত পড়েছিলেন এখন থেকে আপনি যেদিকে ক্বিবলাহ সেদিকে মুখ করে সলাত আদায় করবেন। ক্বিবলাহ তালাশের জন্য এখন আর ইজতিহাদের প্রয়োজন নেই।

আয়িম্মায়ে কেরামদের এই পদ্ধতিই ছিল। যে মাসআলায় তারা হাদীস পাননি ইজতিহাদ করেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে যখন হাদীস পেয়ে গেছেন এবং জেনেছেন যে, কোন গবেষণা হাদীসের বিপরীত ছিল তখন তারা সেই গবেষণা থেকে ফিরে গেছেন। যেভাবে সূর্য উদিত হওয়ার পর প্রকাশ পেয়ে গেল ক্বিবলাহ অমুক দিকে, তাহলে এখন আর ক্বিবলাহ ছাড়া অন্য কোন দিকে সলাত আদায় করার সুযোগ নেই। যদি আপনি এমন কোন কাজ করেন তবে সলাত কবুল হওয়া দূরের কথা উল্টো গোনাহগার হতে হবে।

নবী করীম (ﷺ) দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার সোয়া চৌদ্দশত বছরের অধিক পার হয়ে গেছে আর আয়িম্মায়ে কেরামদের বারশত বছর। ধরে নিন এখন নবী করীম (ﷺ) এবং চার ইমাম দুনিয়ায় জীবিত হয়ে আসলেন এবং নবী করীম (ﷺ) বললেন, এটা করো, অপরদিকে আয়িম্মায়ে কেরাম বললেন, এভাবে নয় বরং এভাবে করো এমন অবস্থায় কার কথা মানা হবে?

এ কথা দিবালোকের মত সত্য যে, নবী করীম (ﷺ)-এর কথা শুনে তার উপরই আমল করা হবে এবং আয়িম্মাদের কথা ছেড়ে দেয়া হবে। এখন তো আমাদের সামনে না নবী করীম (ﷺ) না আয়িম্মায়ে কেরাম। হ্যাঁ, নবী করীম (ﷺ)-এর হাদীসসমূহ আমাদের সামনে আছে আর আয়িম্মায়ে কেরামদের গবেষণা ও মতামত। যদি একদিকে নবী করীম (ﷺ)-এর কোন হাদীস বা সুন্নাহ হয় এবং অপরদিকে কোন ইমামের কথা বা মতামত, তাহলে স্পষ্ট যে, এমতাবস্থায় ইমামের কথাকে ছেড়ে নবী করীম (ﷺ)-এর নির্দেশ মেনে নেয়া হবে। হাদীস অমান্য করার ক্ষেত্রে

কাফির হওয়া অপরিহার্য হয়ে যাবে। এই কারণেই সব ইমাম যারা হাদীস না পাওয়া অবস্থায় ইজতিহাদ করেছেন তারা একথার প্রতি জোরালো তাকিদ দিয়েছেন যে, আমাদের গবেষণার বিপরীত যদি হাদীস এসে যায় তবে আমাদের গবেষণাকে ছেড়ে দিয়ে হাদীসকে নিজের জীবনের আশ্রয় বানাতে হবে।

মুহাদ্দিসরা কি মুক্বাল্লিদ ছিলেন?

রিজাল শাস্ত্রের কিতাবের পাতা উল্টালে জানা যায় যে, মুহাদ্দিসীনে কেবল মুক্বাল্লিদ ছিলেন না। কেননা মুহাদ্দিস হতে অনেক ধরণের জ্ঞান ও শাস্ত্র সম্পর্কে অবগত হতে হয়। উসূলে ফিক্বহের স্বীকৃত নীতিমালা হলো, আলেম কারো মুক্বাল্লিদ হন না। ‘আল-মুসতাসফা ফি ইলমিল উসূল’ কিতাবে ইমাম গাযালী বলেন,

“الْتَّقْلِيدُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْعِلْمِ”

“তাক্বলীদ কোন ধরণের ইলম নয়।”

ইবনুল ক্বায়্যিম ই‘লামুল মু‘আক্বিঈনে লিখেন,

“وَلَا خِلَافَ بَيْنَ النَّاسِ أَنَّ التَّقْلِيدَ لَيْسَ بِعِلْمٍ وَأَنَّ الْمُقَلَّدَ لَا يُطْلَقُ

عَلَيْهِ إِسْمُ الْعَالِمِ”

“এ কথার উপর সবাই একমত যে, তাক্বলীদ কোন ইলম নয়, মুক্বাল্লিদের উপর আলেম শব্দ প্রয়োগ হয় না।”

কিন্তু তাবাক্বাতের কিতাবে দৃষ্টি দিলে মনে হয় সমস্ত মুহাদ্দিস মুক্বাল্লিদ ছিলেন, তাবাক্বাতের লেখকদের অবস্থা এই যে, তারা বড় বড় মুহাদ্দিসকেও তাক্বলিদের জালে ফাঁসানো থেকে দূরে থাকেননি। এটা শুধু কলমের সাফাঈ এর ফলাফল। প্রত্যেক মাযহাবের অনুসারী আয়িম্মায়ে কেবলম এবং সম্মানিত মুহাদ্দিসীন এই ফাঁদে প্রেফতারের চেষ্টা করেছেন। এতে শুধু সাধারণকে খুশি করা এবং মাযহাবের সহযোগিতা করা উদ্দেশ্য ছিল।

অনেক সময় শুধু সম্পর্কের কারণে আয়িম্মায়ে কেলাম এবং মুহাদ্দিসীনে এযামদেরকে তাক্বলীদের দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অথচ বাস্তবতা সম্পূর্ণ এর বিপরীত। সম্পৃক্ততার সম্পর্ক কয়েক কারণে হয় যার সাথে তাক্বলীদের অবকাশ কোনক্রমে পাওয়া যায় না।

১. উস্তাযের দিকে নিসবতের কারণে। অর্থাৎ কোন মুহাদ্দিসের উস্তায যিনি কোন এক মাযহাবের সাথে সম্পৃক্ত।

২. এলাকায় কোন মাযহাবের আধিক্য হয় তবে সেই এলাকার কারণে সেদিকের সম্পৃক্ততা প্রসিদ্ধ হয়ে যায়।

৩. গবেষণা পদ্ধতির কোন নিয়ম কোন একজনের সাথে মিলে যায় তখন সেই ইমামের দিকে সম্পৃক্ত করে দেয়া হয়। যেমন শাহওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী বলেন,

"وَكَانَ صَاحِبُ الْحَدِيثِ أَيْضًا قَدْ يُنْسَبُ إِلَى أَحَدِ الْمَذَاهِبِ لِكَثْرَةِ مُوَافَقَتِهِ لَهُ، كَالنَّسَائِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ يُنْسَبَانِ إِلَى الشَّافِعِيِّ".

“মুহাদ্দিসকেও কোন কোন সময় এক মাযহাবের সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া হয় (গবেষণা পদ্ধতিতে) তার সাথে অধিক মিল থাকার কারণে। যেমন, নাসায়ী, বাইহাক্বীকে শাফিঈর দিকে নিসবত করা হয়”।^{৯৫}

এভাবে শাইখ আব্দুল কাদের জিলানীকেও অধিক ঐক্যতার কারণে হাম্বলী বলে দেয়া হয়েছে। নতুবা তিনি তাক্বলীদকে আলোচনায় রাখতেন না। তিনি তাঁর কিতাবে সাধারণত হাদীস থেকে দলীল দেন। শুধুমাত্র আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহমতুল্লাহি) এর কথাকে দলীল হিসেবে নিয়ে আসেন না। অথচ মুক্বাল্লিদের দলীল হল তার ইমামের কথা। যেমন মুসাল্লামুস সুবুতে রয়েছে,

"أَمَّا الْمُقَلِّدُ فَمُسْتَتَدُّهُ قَوْلُ إِمَامِهِ".

“মুকাল্লিদের দলীল হল তার ইমামের কথা”

মাওলানা আব্দুল হাই লাখনোভী তার কিতাব আন-নাফি‘উল কবীরে (পৃষ্ঠা:১৩,১৫) লিখেন,

"إِنَّمَا أَنْتَسِبَ إِلَيْهِ لِسُلُوكِهِ طَرِيقَةَ الْإِجْتِهَادِ."

অর্থাৎ কখনো গবেষণাগত মিল থাকার কারণে কোন ইমামের দিকে সম্পৃক্ত করে দেয়া হয়।

৪. কোন মুহাদ্দিস নতুন কিতাব লিখেছেন এবং তার অধিকাংশ সেই ইমামের গবেষণা অনুযায়ী হয়ে গেছে তখন তাকে সেই ইমামের দিকে সম্পৃক্ত করে দেয়া হয়েছে।

৫. রাষ্ট্রের ভয়ে নিসবত সেদিকে করে দিয়েছেন যার দিকে রাষ্ট্রের আকর্ষণ।

৬. পরবর্তীরা তাবাক্বাতের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য মুহাদ্দিসিনদেরকে তাক্বলীদের কাতারে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।

৭. মাযহাব অনুসারী শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষার কারণে কেউ তাকে সেদিকে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। এই শেষ যুগে তার উপমা হচ্ছেন মাওলানা ছানাউল্লাহ আমর তাসরী (আমর তাসরী) যিনি দারুল উলূম দেওবন্দে শিক্ষা লাভ করেন। যখন দেওবন্দ সংখ্যা প্রকাশ হলো তখন তাকে দেওবন্দের কাতারে এনে দাঁড় করানো হয়। অথচ তিনি আহলে হাদীস মতাদর্শের অনুগত এবং তার দাঈ ছিলেন।

সংক্ষেপে এই যে, কোন মুহাদ্দিস কারো মুক্বাল্লিদ ছিলেন না বরং স্বতন্ত্র মুজতাহিদ ছিলেন। উপরোক্ত কারণের কোন একটির কারণে কারো মতাদর্শের দিকে সম্পৃক্ত করে দেয়া হয়েছে। যেমন প্রসিদ্ধ শাফিঈ ইমাম ক্বাফ্ফাল বলেন,

"لَسْنَا مُقَلِّدِينَ لِلشَّافِعِيِّ بَلْ وَافَقَ رَأْيُنَا رَأْيَهُ."

"আমরা শাফিঈর মুক্বাল্লিদ নই বরং আমাদের অভিমত তাঁর অভিমতের সাথে মিলে গেছে।"

আমরা কি ইমাম বুখারী (আমর তাসরী)-এর তাক্বলীদ করি?

মুক্বাল্লিদগণ বলেন তাক্বলীদ থেকে কে বাদ পড়েছে, আপনারাও তো ইমাম বুখারী (আমর তাসরী) এর তাক্বলীদ করেন।

বাহ! জনাব, একটু বলুন, সময়ের রাষ্ট্রপ্রধানের মুখপাত্র যদি রাষ্ট্রপ্রধানের হুকুম শুনিয়ে দেয় তবে তা মুখপাত্রের হবে নাকি

রাষ্ট্রপ্রধানের? আপনারা কি তাকে বলতে পারেন, যাও আমরা তোমার কথা মানি না! চিন্তা করে ন্যায়ের সাথে বল তুমি কি বলছো?

আমাদের এবং ইমাম আবু হানিফা (রাহিমাহুল্লাহ) এর মাঝে কয়েক শতাব্দীর পার্থক্য এবং হেদায়া, কানযুদ দাক্বায়িক্ব, ফতোয়া আলমগীরি, কুদুরী এবং দুররে মুখতারের মাঝে শত শত বছরের পার্থক্য। মানুষেরা তাদের ফতোয়ার উপর আমল করে এবং নিজেকে হানাফী বলে। কিন্তু কেউ এটা বলে না যে, আমি হেদায়া দুররে মুখতার ইত্যাদির মুসান্নিফের মুক্বল্লিদ। কেউ যদি এটা বলে যে, ছাত্র তো উস্তাযেরটাই বর্ণনা করে এজন্য উস্তায যা বর্ণনা করেন সে তাই গ্রহণ করে নেয় এটাই তাক্বলীদ, তার এই ধারণা মারাত্মক ধরণের ভুল। কেননা:

প্রথমত: তাক্বলীদ ঐ সময় হবে যখন ছাত্র শিক্ষকের আবিষ্কার করা বিষয় মেনে নিবে। শিক্ষক তাকে নিজের গবেষণা পড়াচ্ছেন নাকি বর্ণনা শিখাচ্ছেন। যদি বর্ণনা শিখান তবে এটা তাক্বলীদ নয়। যদি এটাকে তাক্বলীদ বলে তাহলে ইমাম সাহেবের কথা কার কথায় গ্রহণ করেন। যদি বলেন, হেদায়া এবং দুররে মুখতার ইত্যাদির লিখকের কথায় তবে তাসালসুল লাযেম হবে, আর তাসালসুল অকার্যর।

এখন একটু ইনসাফ করে বলুন, হেদায়া ইত্যাদিতে কার কথা আছে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কথা আছে, নাকি উম্মতের কথা? কিছু সময় মেনে নিলাম যে, কুরআন হাদীস থেকে উদঘাটিত, কিন্তু হে আল্লাহর বান্দা, এটাতো নবীর প্রকৃত কথা নয়।

“মেশ্কের সুগন্ধি আছে কিন্তু এ তো মেশ্ক নয়”

বর্ণনা গ্রহণ করা এবং তাক্বলীদ

মুহাদ্দিসগণ যেসব হাদীস সংকলন করেছেন এবং লিখেছেন সেগুলো তাদের কাছ থেকে যারা শ্রবণ করেছেন তাদেরকে তাদের মুক্বল্লিদ বলা যেতে পারে না। কেননা এ হাদীসগুলো মুহাদ্দিসদের কথা নয় বরং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কথা যেগুলো মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন। মুহাদ্দিস এবং অন্যান্য বর্ণনাকারীরা শুধুমাত্র এর মাধ্যম। যেমন ফিক্বহের

কিতাবাদির লেখক এবং অন্যান্য হানাফী আলেম ইমাম আবু হানিফা (রহমতুল্লাহি আলাইহ) এর কথা বর্ণনার ক্ষেত্রে শুধু এক প্রকার মাধ্যম, তাদের থেকে গ্রহণকারীদেরকে তাদের মুক্বাল্লিদ বলা হয় না। এছাড়া বর্ণনাকারীর বর্ণনাকৃত কথা মান্যকারীকে যদি মুক্বাল্লিদ বলা হয় তবে এটা মানতে হবে যে, চার ইমামও মুক্বাল্লিদ ছিলেন। কেননা তারাও তো হাদীসগুলো হাদীসের বর্ণনাকারী এবং মুহাদ্দিসদের থেকেই নিয়েছেন। তারা নিজে তো হাদীসগুলো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুখ থেকে শুনেনি। অথচ তারা মুক্বাল্লিদ এ কথা মানা হয় না। সুতরাং মুহাদ্দিসদের বর্ণিত হাদীস নেয়ার ভিত্তিতে কেউ তাদের মুক্বাল্লিদ হয় না।

হিন্দুস্থানে দ্বীনের জ্ঞানশিখবে কোথা থেকে,

গভীর চিন্তা, কর্ম মুখর দেখি নাতো কাউকে।

জ্ঞানের হালকায় নেই তো সেই সাহসী মানসিকতা,

আহ! গবেষণার পতন ঘটিয়ে সবাই তাক্বলীদেরই প্রজা।

নিজে পরিবর্তন না হয়ে করে কুরআনের পরিবর্তন,

তাওফীক ছাড়া চার দেয়ালের ভিতরেই আসন।

কিতাব যেন অসম্পন্ন এই তাদের মত

কেননা, কিতাবতো শিখায়নি মুমিনকে দাসত্বের পথ।

তাক্বলীদের প্রকার বিশ্লেষণ

তাক্বলীদ চার প্রকার: (১) ওয়াজিব। (২) মুবাহ। (৩) হারাম। (৪) শির্ক।

ওয়াজিব: অজানা অবস্থায় কোন মুজতাহিদের এই শর্তে তাক্বলীদ করা যে, ঐ সময় পর্যন্ত তাঁর কথা মানব যতক্ষণ পর্যন্ত এর বিপরীত কোন কিতাব এবং সুন্নাহ সামনে না আসে।

মুবাহ: নির্দিষ্ট মাযহাবের তাক্বলীদ করে তবে একে শরীয়তের হুকুম বলে মনে করে না এবং গোঁড়ামি রাখে না।

হারাম: কোন মুজতাহিদের সমস্ত মাসআলা শারঈভাবে ওয়াজিব মনে করে এবং এই বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং ইমামের তাক্বলীদকে জরুরী করেছেন। কুরআন এবং হাদীস থেকে সরাসরি উপকৃত হওয়ার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

শিরক: কোন ব্যক্তির তাক্বলীদকে অপরিহার্য করে নেয়া এবং তাতে এ পরিমাণ বাড়াবাড়ি যে, কুরআন হাদীস আসার পরও ইমামের কথা ছাড়ার উপর প্রস্তুত নয়। বরং ব্যাখ্যা ও বিকৃতি করা থেকেও ফিরে না এবং ব্যাখ্যা করে নিজের ইমামের কথার মোতাবেক বলে। নিজের ইমামের কথাকে কুরআন হাদীসের মোতাবেক বানিয়ে ইমাম যা হালাল বলেন সেটাকে হালাল বলে আর ইমাম যেটাকে হারাম বলেন সেটাকে হারাম বলে।

তাক্বলীদের উপরোক্ত ভাগ একেবারে এমন যেমন কেউ বলল, বিদ'আত দুই প্রকার: বিদ'আতে হাসানাহ, বিদ'আতে সাযিয়াহ। অথচ নবী করীম (ﷺ) বলেছেন, প্রত্যেক বিদ'আত গোমরাহী, তাহলে বিদ'আত হাসানাহ কিভাবে হতে পারে।

যাই হোক প্রথম প্রকার তাক্বলীদের কথা এটাতো মূলত কোনক্রমেই তাক্বলীদ নয়। কেননা একজন সাধারণের জন্য আলেম থেকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করা মানে উপকৃত হওয়া আর এটা কুরআনের নির্দেশ। প্রকৃতপক্ষে তাক্বলীদের এই চার প্রকার শাহ ওয়ালিউল্লাহ তাঁর 'ইকদুল জিদ' কিতাবে স্থান দিয়েছিলেন, বর্ণনার পর বর্ণনার ফলাফল এই হলো যে, অনেক আলেম এটাকে নিজ নিজ কিতাবে স্থান দিয়েছেন, অথচ তাক্বলীদের কোন প্রকারের সম্ভাবনা নেই।

জারহ (দোষ বর্ণনা) সাব্যস্ত করতে সমসাময়িক হওয়ার শর্ত

* আপনারা বলেন যে, দোষ বর্ণনা নিশ্চিত করতে সমকালীন হওয়া জরুরী। (উদ্দেশ্য এটা বলা যে, ইমাম আবু হানিফা (রাহিমাহুল্লাহ) এর উপর তাঁর যুগের পরের মানুষেরা জারহ (দোষ বর্ণনা) করেছেন, তাই এটা গ্রহণযোগ্য নয়)

* একথা অবশ্যই ইলমে হাদীস মান্যকারীদের জন্যও একটি নবজ্ঞান। আপনারা কি বলতে পারেন উসূলে হাদীসের কোন কিতাবে বর্ণিত নীতিমালাটি রয়েছে?

* একথার আলোকে জরুরী যে, হাদীস শাস্ত্রের পণ্ডিতগণ বা জারহ ও তা'দিল শাস্ত্রের ইমামরা শুধুমাত্র নিজ যুগের হাদীস বর্ণনাকারীর উপর জারহ তা'দিল করতে পারেন। নিজ কালের পূর্বের লোকজন বা বর্ণনাকারীদের উপর তাদের জারহ ও তা'দিলের অধিকার নেই। যদি করেন তবে তা বিশ্বাসযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন: ইয়াহইয়া ইবনে মাস্ঈন, ইবনে 'উয়াইনাহ, ইবনে মুবারক, সাঈদ ইবনে ক্বাত্তান, আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইমাম বুখারী, ইমাম আবু যুর'আহ রাযী, ইমাম আবু হাতিম, ইবনে হিব্বান, ইমাম মুসলিম, ইমাম নাসাঈ, ইমাম তিরমিযী, ইমাম হাকেম, ইমাম দারাকুতুনী, ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ ^(হযরতগণের আলমগীর) দের মত ইমামগণ তাঁদের যুগের পূর্বের যেসব বর্ণনাকারীদের উপর জারহ করেছেন এ সব আপনার বর্ণিত কথা মতে প্রত্যাখ্যান হয়ে যায়। জ্ঞানের জগতে এই দুর্লভ গবেষণার মাধ্যমে নিশ্চয়ই ধ্বংস উত্তোলিত হয়ে যাবে এবং হাদীস শাস্ত্রের পুরো নথি আবার শুরু থেকে যাচাইয়ের প্রয়োজন হবে।

* উল্লিখিত কথা আপনার জ্ঞান এবং বিশেষভাবে হাদীস শাস্ত্র থেকে আপনার দূরে থাকার স্পষ্ট প্রমাণ। কেননা হাদীসের পণ্ডিত ও শাস্ত্রবিদদের নিকট সমকালীন হওয়া জারহ গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্ত নয়, বরং “অনেক ক্ষেত্রে” সমকালীন হওয়ার কারণে জারহ গ্রহণযোগ্য নয় বলে মনে করা হয়। কেননা “إِنَّ الْمُعَاصِرَةَ أَصْلُ الْمَنَافَرَةِ” সমকালীন হওয়া পরস্পরের বিভেদ ও ঘৃণার ভিত্তি হয়। তাই যদি সমসাময়িক মানুষ জারহ করেন তবে এই সম্ভাবনা রয়েছে যে, হতে পারে শুধুমাত্র সমকালীনগত বিরোধিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভিত্তিতে ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে এবং দোষ বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। তাই জারহ গ্রহণ করার নির্ধারিত কিছু শর্ত রয়েছে। যেমন, ঐ সমালোচনা গ্রহণযোগ্য যা বিস্তারিত বিবরণসহ হবে। (বিশেষ করে সেই বর্ণনাকারীর ক্ষেত্রে যার বেলায় কেউ তা'দিল করেছেন আবার কেউ জারহ

করেছেন, এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে স্পষ্ট জারহ তা'দিলের উপর অগ্রাধিকার পাবে।)

* মনে করুন যদি আপনাদের এই অপ্রমাণিত, ভিত্তিহীন এবং যুক্তিহীন কথা মেনেই নেয়া যায় তথাপি আপনারা আপনাদের উদ্দেশ্য সফল হতে পারবেন না। কেননা হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফার উপর সমালোচক তাঁর সমকালীন ব্যক্তিবর্গও রয়েছেন। যেমন, ইমাম সুফইয়ান ছাওরী ^(হুসাইন বিন আলিহ), ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক ^(হুসাইন বিন আলিহ) ও অন্যান্যরা।

সারকথা, আপনাদের কথার না কোন মূল্য আছে, না এতে আপনাদের উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে।

ব্যক্তিসত্তার তাক্বলীদ এবং চিন্তা দর্শনের দোহাই

কেউ কেউ বলেন, আমরা ব্যক্তিসত্তার তাক্বলীদের প্রবক্তা নই, আমরা তো এই চিন্তা দর্শনের প্রবক্তা। একথাও ঠিক নয়। ভুল এবং দুর্বল অবস্থান অবলম্বনের এই ফলাফলই দাড়ায় যে, মানুষ কোন এক কথার উপর টিকে থাকতে পারে না। একটু পরিস্কার করুন “আমরা ব্যক্তিসত্তার তাক্বলীদের প্রবক্তা নই” এ কথার মাঝে “আমরা” দ্বারা উদ্দেশ্য কে? হানাফী সমস্ত আলেম এবং সাধারণ, নাকি শুধু আপনি এবং আপনার অনুসারী? এই প্রশ্ন আমরা এ জন্য করছি, কেননা এখন পর্যন্ত আপনাদের আকাবির আলেমগণ এই দাবী করছেন যে, ব্যক্তিসত্তার তাক্বলীদ জরুরী। টেনে হিঁচড়ে সাহায্যে কেরাম ^(হাদীস আল-আলম) থেকেও ব্যক্তিসত্তার তাক্বলীদের প্রমাণ উপস্থাপন করেন। (তাক্বলীদ প্রমাণে হানাফী আলেমদের সার্বজনীন কিতাবগুলো দেখা যেতে পারে) এছাড়া আপনাদের আলেমরা ব্যক্তিসত্তার তাক্বলীদ প্রমাণের জন্য পুরো শক্তি ব্যয় করেন, আপনাদের উল্লিখিত কথা মেনে নিলে সেই বুয়ুর্গদের সমস্ত চেষ্টা এক কথায় প্রত্যাখ্যান করে দেয়া হলো। যাই হোক, আমরা এতে আনন্দিত। আপনারা একভাগ হলেও আমাদের সাথে একমত হয়েছেন যে, আপনারা ব্যক্তিসত্তা তাক্বলীদের প্রবক্তা নন। আবেদন রইল যে, এই চিন্তার প্রচার নিজ পরিধিতে করুন যেখানে বিশেষ ও সাধারণ সবাই ব্যক্তিসত্তার তাক্বলীদ ওয়াজিবের প্রবক্তা।

দ্বিতীয়ত: আপনাদের কাছে এই প্রশ্ন যে, “আমরা এই চিন্তা দর্শনের প্রবক্তা” একথায় চিন্তা দর্শন দ্বারা কি উদ্দেশ্য? এর উদ্দেশ্য যদি এই হয়, হানাফী মতাদর্শে শুধু ইমাম আবু হানিফা (রাহিমুল্লাহ) এর মতামতের উপর ফতোয়া দেয়া হবে, সাহেবাইন এবং অন্যান্য ফক্বীহদের কথাও মুফতা বিহি (ফতোয়া হিসেবে গৃহীত), এই প্রশ্ন থেকে আপনারা এই বলে বাঁচতে চান যে, অনেক কথায় আপনারা ইমাম আবু হানিফা (রাহিমুল্লাহ) এর কথা ছেড়ে অন্যদের ফতোয়া মানেন তবেও তো কথা এই। কেননা এই চিন্তাধারাও তো এমন জিনিস নয় যার অনুসরণ অনুকরণের নির্দেশ আল্লাহ দিয়েছেন। এটা এক ব্যক্তির পরিবর্তে এক ব্যক্তির দিকে সম্পৃক্ত মতাদর্শের তাক্বলীদ হলো। এবং এর সার কথা হলো এই যে, এই দর্শনের বিপরীত যদি কুরআন মাজীদে বাণী, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সহীহ হাদীস, সাহাবায়ে কেরাম (রাহিমুল্লাহ) এবং অন্যান্য ইমামের মতামত হলেও সব প্রত্যাখ্যান করা হবে। শুধু মতাদর্শ বা দর্শনের পাঠশালার কথা মানা হবে। শাহ ওয়ালিউল্লাহর হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ এর আরো উপদেশ দেখুন, তিনি আহলে রায়দের (ক্বিয়াসবাদী) প্রত্যাখ্যান করে আহলে হাদীসদের পদ্ধতির স্বীকৃতি দেন এবং ওসিয়ত করেন যে, আহলে হাদীসদের পদ্ধতি গ্রহণ করো।

মোটকথা ব্যক্তিসত্তার তাক্বলীদ এবং চিন্তা দর্শনের তাক্বলীদের পার্থক্য করা কেবল শব্দের নিরর্থক খেলা। এতে মূল ব্যাপারে কোন পার্থক্য সৃষ্টি হবে না। চিন্তা দর্শনের প্রবক্তা হয়েও কুরআন সুন্নাহর অনুসারী হতে পারবে না।

মুহাদ্দিসীনে কেরামের তাসহীহ তায্ঈফ (সনদের হকুম লাগানো) মেনে নেয়া তাক্বলীদ নয়

আপনাদের এই প্রশ্ন থেকে গেল যে, আমরা যখন সনদকে যাচাই ছাড়াই মেনে নেই তাহলে আমরাও তো কমপক্ষে এতটুকুর মুক্বাল্লিদ হলাম। বারংবার এই আপত্তি মানুষের মাঝে সাধারণত এভাবে তুলে ধরা হয় যে, হাদীস সহীহ এবং যঈফ হওয়া, গৃহীত এবং পরিত্যাজ্য হওয়ার হকুম মুহাদ্দিসগণ নির্ণয় করেন। সাধারণ মানুষ বা প্রত্যেক আলেম এবং জাহেল

এই হুকুম লাগাতে পারে না এবং এর যোগ্য হয় না, তাহলে এ ব্যাপারে সব মানুষ মুহাদ্দিসদের ফায়সালাকে মেনে নেন। যেন এখানে তাক্বলীদ অস্বীকারকারীরাও তাক্বলীদ করেন বা করতে বাধ্য হন। কেউ কেউ কথাটি আরেকটু বৈচিত্রময় করে বলেন, বলুন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) নিজে কোন হাদীসকে সহীহ এবং কোন বর্ণনাগুলোকে যঈফ বলেছেন? কেননা যদি আল্লাহ এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ছাড়া অন্য কেহ সহীহ বলা এবং যঈফ বলা মেনে নেয়া যায় তবে এটাতো তাক্বলীদ হয়ে যাবে, আর আপনারা তাক্বলীদ বিরোধী। কেউ এই আপত্তিকে এভাবে উপস্থাপন করেছেন যে, প্রত্যেক সাধারণ ব্যক্তি এবং অজ্ঞ কি হাদীসের মধ্যে সহীহ এবং যঈফ জানতে পারে? যদি না হয় তবে সেও তো তাক্বলীদ করছে, ইত্যাদি। মোটকথা, এই আপত্তি শব্দ পরিবর্তন করে বিভিন্নভাবে করা হয়।

যখন এই আপত্তিই শুদ্ধ নয় তখন এটা বলা অতিরঞ্জন হবে না যে, আপত্তিকারী বুঝেইনি সে কী বলছে। সে তাক্বলীদ করে কিন্তু এর মর্ম বুঝে না।

তাক্বলীদ করা এবং তার বৈধতা দেয়ার জন্য বলে আমরা মূর্খ, কুরআন হাদীস নিজে বুঝার যোগ্যতা নেই এ জন্য তাক্বলীদ করি। কিন্তু তাক্বলীদের শারঈ দৃষ্টিভঙ্গি প্রমাণ করতে “আল্লামা” হয়ে নিত্য নতুন জ্ঞানের অপূর্ব শৈলী উপস্থাপন করে বলে যে, দেখো এভাবে তাক্বলীদ প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ তাক্বলীদ প্রমাণ করার জন্য তারা কুরআন, হাদীস এবং যুক্তিবিদ্যা খুব ভাল বুঝতে শুরু করেন।

এখন উল্লিখিত আপত্তির উত্তর লক্ষ্য করুন:

দ্বীনী বিষয়ে নবী ছাড়া অন্য কারো “রায়” গ্রহণ

মুহাদ্দিসগণ যে হাদীসগুলো বর্ণনা করেন এবং সহীহ ও যঈফ হওয়ার হুকুম নির্ণয় করেন বর্ণনার নীতিমালার আলোকে এটি তাদের যাচাই এবং খবর। তাদের গবেষণা, রায় নয়।

রায় এবং রেওয়ায়েত অথবা ইজতিহাদ এবং খবরের মাঝে পার্থক্য বর্ণনার মুখাপেক্ষী নয়। উদাহরণস্বরূপ, এক ব্যক্তি বলল, “আমার মতামত এটা”, আরেক ব্যক্তি বলল, “আমি এমন শুনেছি বা দেখেছি”, এখানে

মতামত বিশিষ্ট বাক্য হলো রায়, আর শুনেছি বা দেখেছি বাক্যে খবর দেয়া হয়েছে। উভয় বাক্য এক নয়। এভাবে পবিত্র শরীয়ত নবী ﷺ ছাড়া অন্য কারো রায় বা গবেষণাকে গ্রহণ করা কোন মুসলিমের উপর ওয়াজিব করেনি। (অর্থাৎ তাকুলীদের নির্দেশ দেয়নি) কিন্তু শরীয়ত নির্ভরযোগ্য এবং ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য এবং খবর গ্রহণ করতে আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾

“হে ঈমানদারগণ, যদি তোমাদের কাছে কোন ফাসেক (পাপাচার ব্যক্তি) কোন খবর নিয়ে আসে তবে তোমরা তা যাচাই নিরীক্ষণ করে নাও।”^{৯৬}

এর বিপরীত অর্থ হলো, কোন ন্যায়বান এবং পরহেযগার বা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি খবর নিয়ে আসলে তা গ্রহণ করে নাও। এ ছাড়া শাহাদাত বা সাক্ষ্যের ধারাবাহিকতায় অনেক আয়াত ও হাদীস রয়েছে যেখানে খবরকে গ্রহণ করার অনেক দলীল বিদ্যমান।

অতএব আমরা যখন মুহাদ্দিসগণের হাদীস বা সনদ সম্পর্কের কথাগুলো মেনে নেই তখন তাকুলীদ করি না, বরং শরীয়ত নির্দেশ মোতাবেক বর্ণনা, খবর বা শাহাদতকে গ্রহণ করি, কেননা শরীয়ত তা গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছে। মানুষের রায় কুবুলের নির্দেশ দেয়নি।

সমাপ্ত

শারঈ মানদণ্ডে তাকলীদ

প্রশ্ন ও সংশয় নিরূপণ



লেখক

হাফেয জালালুদ্দীন কাসেমী

(ফাযেলে দারুল উলুম দেওবন্দ, ভারত)